তিন বন্ধু

কিশোর • মুসা • রবিন

তিন বন্ধু
কিশোর থ্রিলার

চাঁদের অসুখ

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের;
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

লোউইনের আগের রাতে ফ্লুতে আক্রান্ত হলো কিশোর আর মুসা। দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো। হ্যালোউইনের জন্যে প্ল্যান মাফিক পোশাক বানানোও আর হলো না।

সুতরাং, হ্যালোউইনের রাতে কোনমতে একটা কিছু বানিয়ে পরে নিল দুজনে। হলুদ একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে হলুদ পাজামা পরল মুসা। বড় একটা প্ল্যাস্টিকের মগের হাতল কেটে ফেলে দিয়ে উপুড় করে মাথায় বসাল টুপির মত করে। টেপ দিয়ে আটকে দিল কপালের সঙ্গে, যাতে খসে না পড়ে।

কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে বসে সাজগোজ করছে দুজনে। রবিন এখনও আসেনি।

মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি সাজ হলো?'

'মগা,' জবাব দিল মুসা।

'মগা মানে তো বোকা। তুমি কি বোকা?'

কান চুলকে জবাব দিল মুসা, 'না, বোকা না। একটা কিছু সাজা দরকার, সাজলাম। নাম দেয়া দরকার, দিলাম।'

'ভাল কথা। নামটা মগা না রেখে মগ-বয় রাখো, ভাল শোনাবে।'

'ঠিক! আসলেই আমি বোকা। তুমি কেমন চট করে সুন্দর একটা নাম রেখে দিলে। আমার মাথাতেই আসছিল না।'

কালো একটা পুরানো চাদরের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে দিল কিশোর। আলখেল্লার মত গলা থেকে ঝুলে রইল চাদরটা। চাদরের টুকরো দিয়ে কালো মুখোশ বানাল। হাতে তুলে নিল একটা পুরানো মরচে পড়া তলোয়ার। ইয়ার্ডের জঞ্জাল থেকে খুঁজে বের করে এনেছে।

'তুমি কি সাজলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কালো জলদস্যু। ব্ল্যাক পাইরেট।'

'ভালই হয়েছে, কি বলো?' হাসল মুসা। 'তাড়াতাড়ির মধ্যে এরচেয়ে ভাল আর কি হবে, তাই না?...চলো, বেরোই।'

'রবিন তো এখনও এল না।'

'চলো, বাড়ি থেকে ডেকে নেব।' বেঞ্চে রাখা একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিল সে। ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগ। লোকের দেয়া উপহার রাখবে এর মধ্যে।

'বেশ, চলো,' আরেকটা ব্যাগ তুলে নিল কিশোর।

বাইরে বেরোল দুজনে। পরিষ্কার রাত। ভীষণ ঠাণ্ডা। হালকা তুষারে চকচক করছে লনের ঘাস। নির্জন ইয়ার্ড। লিভিং রুমের জানালায় আলো। চাচা-চাচী টেলিভিশন দেখছেন। একটু পরেই ট্রে ভর্তি নানা রকম লোভনীয় জিনিস নিয়ে বারান্দায় এসে বসবেন মেরিচাচী। অন্য বাড়ি থেকে আসা ছেলেমেয়েদের ব্যাগে উপহার তুলে দেয়ার জন্যে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'পূর্ণিমা।' মুসার দিকে ফিরল, 'হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে কি হয়, বলো তো?'

কেঁপে উঠল মুসা। চট করে চোখ সরাল চাঁদের দিকে। 'ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো এখন!'

হাসল কিশোর। 'এ সব বিশ্বাস করো তুমি?'

'দেখো, হাসাহাসি কোরো না। ইনডিয়ানদের অনেক ব্যাপারই অদ্ভুত, ওদের অনেক কিংবদন্তী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।'

'তাই বলে নেকড়ে-মানব হওয়ার কথা আর ফলবে না। একেবারেই গাঁজা।'

'থাক থাক, এখন ওসব আলোচনার দরকার নেই। যে কাজ করতে চলেছি, করিগে। চলো যাই।'

কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারল না ওরা। জঞ্জালের একটা স্তূপের ওপাশ থেকে ঘাউৎ করে এক চিৎকার দিয়ে সামনে এসে পড়ল একটা ভয়ঙ্কর জীব। আধা-মানব আধা-জন্তু। চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল একবার। তারপর টলতে টলতে এগোলো। দুই হাত তুলে করুণ স্বরে চিৎকার করে বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বাঁচাও…আমাকে বাঁচাও, ভাই…'

*

'বাবাগো! খেয়ে ফেলল!' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় মারল মুসা।

থাবা দিয়ে কিশোরকে ধরতে এল মূর্তিটা।

ঝট করে সরে গেল কিশোর। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে। আচমকা লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে জন্তুটার কুকুরে-নাকটা চেপে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান।

লম্বা মুখোশটা খুলে এল তার হাতে। 'রবিন!'

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে গেছে মুসা। ফিরে তাকাল। ভালমত দেখল একবার। ফিরে এসে বলল, 'উফ্, জানে একেবার ধুকপুকানি তুলে দিয়েছিলে!'

'তারমানে সাজটা নিখুঁত হয়েছে,' হেসে বলল রবিন। কিশোরের হাত থেকে আবার নিয়ে নিল মুখোশটা। 'রাস্তায় যে দেখবে সেই ভয় পাবে। আসার সময় দেখে এলাম শুঁটকিরাও বেরিয়েছে ব্যাগ নিয়ে। শুঁটকি আর টাকি।'

'কি সাজল?' মুসার প্রশ্ন।

'ভাঁড়। দুজনেই। পোশাকের রঙ আলাদা।'

'ভাঁড়ই ও দুটো। ভয় দেখাওনি?' মুসার প্রশ্ন।

'না, বুঝতে পারিনি এতটা নিখুঁত হয়েছে আমার সাজ। তোমাদেরকে দেখানোর পর শিওর হলাম।'

'তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম। সময়মত এসে গেছ,' কিশোর বলল, 'চলো, আমরাও বেরোই।'

দুই

'চলো, ওদিকটায় যাওয়া যাক আগে,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল টেরি। 'রাস্তার মাথা দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্য রাস্তায় পড়ব।'

'টেরি, কি মনে হয় তোমার?' টাকি বলল। 'আপেল-টাপেল আবার দেবে না তো কেউ? ও জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারি না আমি। তারচেয়ে টক লেবেনচুষ দিলেও ভাল।'

'দিতেও পারে,' মুখ বাঁকাল টেরি। 'রকি বীচের সবগুলান তো কিপটে। আমি টক লেবেনচুষও দেখতে পারি না। মুখে দিলেই চুকার ঠেলায় গাল-মুখ বাঁকা হয়ে যায়।...দিলে আর কি করব, নিয়ে এসে ফেলে দেব।'

'কিন্তু হ্যালোউইনের উপহার ফেলা তো ঠিক না।'

'কে আর দেখতে যাচ্ছে। চোখে না দেখলে সবই ঠিক।'

ক্যান্ডির আলোচনা করতে করতে রাস্তার প্রথম ব্লকটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। প্রথম বাড়িটা থেকে দিল ছোট ছোট হারশি চকোলেট বার। দ্বিতীয়টা থেকে দুই ব্যাগ ক্যান্ডি কর্ন। তৃতীয়টা মিলকি ওয়ে ক্যান্ডি।

খুশি হলো দুজনে। শুরুটা চমৎকার।

ঘণ্টাখানেক ধরে বাড়ি বাড়ি ঘোরার পর ওদের ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগগুলো বোঝাই হয়ে গেল। ফুলে উঠে ফেটে পড়তে চাইছে।

'চলো, বাড়ি চলে যাই,' টাকি বলল। 'অনেক হয়েছে। বাড়ি গিয়ে খাওয়া শুরু করা দরকার।'

'চলো,' বলেই আরেকটা বাড়ির ওপর নজর পড়ল টেরির।

টেরির দৃষ্টি অনুসরণ করে টাকিও তাকাল সেদিকে। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায়, শেষ ব্লকটা থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে পুরানো, ভাঙাচোরা পোড়ো দুর্গের মত বাড়িটা। ঘন গাছপালা, লতাপাতায় ঘেরা। দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে, গা ছমছম করে; রাতের বেলা তো সাংঘাতিক। 'ওটা বাকি রয়ে গেল। গিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

খপ করে টেরির হাত চেপে ধরে টান মারল টাকি, 'টেরি, দোহাই তোমার! বাড়ি চলো!...ওটা মিসেস জোরোবেলের বাড়ি।'

'সেজন্যেই তো যেতে চাইছি,' টাকির হাতটা ছাড়িয়ে নিল টেরি। 'চলো, দেখি, মিসেস জোরোবেল কি দেয়?'

'না না, প্লীজ!' অনুরোধ করতে লাগল টাকি। 'তুমি জানো, ওখানে যাওয়াটা উচিত হবে না আমাদের।'

'কেন হবে না?'

'আমাদের দেখতে পারে না বুড়ি। বল মেরে যে জানালার কাঁচ ভেঙে দিয়েছিলে, ভুলে গেছ?' পাগলের মত চেঁচানো শুরু করেছিল মহিলা। পুলিশ ডাকার হুমকি দিয়েছিল। মহিলার উগ্রমূর্তির কথা কল্পনা করে শিউরে উঠল টাকি।

'ভুলব কেন? বলটা ফেরত দেয়নি, সে-কথাও মনে আছে। দেখি, আজ ক্যান্ডি এনে খানিকটা উসুল করতে পারি কিনা।'

'ক্যান্ডি দেবে কে বলল তোমাকে? বুড়ি আমাদের ঘৃণা করে।' টেরিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আবার তার হাত ধরে টানল টাকি।

'বুড়ি আমাদের চিনবে কি করে?' না দেখে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই টেরির। 'মুখে আমাদের মুখোশ। চলো। দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে দেখি, কি ঘটে। কোন্ ধরনের ক্যান্ডি আমাদের উপহার দেয় বুড়ি।'

'আমি যাব না।' মুখোশ খুলে নিল টাকি। কপালে ঘাম চকচক করছে। 'ও বাড়ির ধারেকাছে যাব না আমি। বুড়িটা পাগল। তুকতাক জানে। বিপজ্জনক। লোকে বলে, ডাইনী।'

হেসে উঠল টেরি। 'হুঁ, ডাইনী না কচু! নাকি তুমি ভাবছ, গিয়ে দেখবে ডাইনীর ঝাঁটায় চড়ে চাঁদের মুখো হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বুড়িটা?'

'সত্যি সে ডাইনী!' বোঝানোর চেষ্টা করল টাকি। 'আমাদের পাশের গলির মিসেস ডুগানকে জাদু করেছিল। চোখের পাতা ফেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মিসেস ডুগানের। বন্ধ আর করতে পারে না। বোঝো, ঘুমাতে কি রকম কষ্ট হয়!'

টেরির হাত ধরে টান দিল আবার সে। 'চলো, বাড়ি গিয়ে গুণে দেখি ক'টা ক্যান্ডি পেলাম। আর কি কি জিনিস।'

'মাত্র তো একটাই বাড়ি,' টাকির হাত ছাড়িয়ে নিল টেরি। 'এসো। আজকে হ্যালোউইন। এমনিতেই ভয়ের রাত। আরেকটু ভয় নাহয় পেলামই।'

দ্রুত হাঁটতে শুরু করল টেরি।

'আমি এখানেই থাকি,' টাকি বলল। 'তুমি গিয়ে দেখে এসো...'

'দূর! এসো তো!'

রাস্তার একপাশ ধরে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল টেরি আর টাকি। টেরি আগে, টাকি পিছে। দুজনের হাতে উপহারে বোঝাই ভারী ব্যাগ।

গেটটা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। দুই পাশে আগাছায় ভরা খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল সদর দরজার দিকে।

বাঁশের কঞ্চি আর রঙিন কাগজ দিয়ে বানানো বিশাল একটা কুমড়ো রেখে দেয়া হয়েছে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে। মোম জেলে দেয়া হয়েছে ভেতরে। দরজার ওপরে ঝুলছে কৃত্রিম মাকড়সার জাল। দরজার পাল্লার ওপর দিকের খুদে একটা জানালা দিয়ে আলো আসছে।

'টেরি,' শেষবারের মত সাবধান করল টাকি, 'ও আমাদের ঘৃণা করে!'

'চিনছে কি করে? বল মেরেছিলাম, সে তো বহুতদিন। মুখোশের ভেতর দিয়ে চিনতে পারবে?'

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল টেরি। টাকি দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির গোড়ায়। বিপদ দেখলেই দৌড় দেবে।

বেল বাজাল টেরি।

বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুনল না। জোরে জোরে থাবা মারতে লাগল দরজায়।

কয়েক সেকেন্ড পর পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

ব্যাগটা সামনের দিকে তুলে ধরল টেরি।

কুট করে তালা খোলার শব্দ হলো। তারপর ধীরে, অতি ধীরে খুলে গেল পাল্লাটা।

তিন

'কে?' সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিল মিসেস জোরোবেল। মৃদু আলো আসছে তার হলওয়ে থেকে।

মহিলার মুখটা গোল। মসৃণ চামড়া, বয়স হলেও বয়স্কদের মত ভাঁজ নেই। বড় বড় কালো চোখ। লিপস্টিক লাগানো লাল টকটকে ঠোঁট, যেন এইমাত্র রক্ত খেয়ে এল। লম্বা, সাদা, কোঁকড়ানো চুল টেনে পেছনে নিয়ে গিয়ে কালো ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। বেরিয়ে আছে বিশাল কপাল। পরনের সব কিছুই কালো। এমনকি গলাবন্ধ গরম জাম্পারটাও কালো।

মোমের মত সাদা একটা হাত তুলে গালে ঠেকিয়ে ভালমত দেখতে লাগল দুজনকে। 'ভাঁড় সেজেছ, না? সাজা তো উচিত ছিল মায়ানেকড়ে, কিংবা গোরস্থানের ভূত। মায়ানেকড়ে হলেই মানাত ভাল। জানো না,

হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে চাঁদের অসুখে ধরে?'

'চাঁ-চাঁ-চাঁদের অসুখ! সেটা আবার কি?'

'সেটা? চাঁদের দিকে তাকালে নেকড়ে-মানব হয়ে যায় লোকে।'

ফিরে তাকাল টেরি। সিঁড়ি থেকে নেমে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে টাকি।

'আরে, টাকি, যাচ্ছ কোথায়? এসো!' ডাক দিল টেরি।

থেমে গেল টাকি। কিন্তু এগোল না।

মিসেস জোরোবেলের দিকে ফিরল টেরি, 'আমি রবি।' টাকিকে দেখাল, 'আর ও, বব।' এইমাত্র যে টাকির নাম ধরে ডেকে ফেলেছে, খেয়ালেই নেই।

হেসে উঠল মিসেস জোরোবেল। গালে হাতটা চেপে রেখে হাসিমুখে বলল, 'হ্যালোউইনের রাত খুব পছন্দ আমার। সবচেয়ে প্রিয় ছুটির দিন।'

এতটা ভাল ব্যবহার পাবে, আশা করেনি টেরি। অবাক হলো। তারমানে ওদের চিনতে পারেনি মিসেস জোরোবেল।

ট্রীট ব্যাগটা তুলে ধরল টেরি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিসেস জোরোবেল। হাত বাড়িয়ে টেরির টুপিতে আটকে থাকা একটা পাতা টান দিয়ে ফেলে দিল। ব্যাগটার দিকে তাকাল আবার। 'বাহ্, অনেক জিনিস পেয়েছ তো!' টকটকে লাল ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ল হাসি। 'দেখি, আমি কি দিতে পারি।'

ঘুরে ভেতরে চলে গেল মিসেস জোরোবেল।

টাকির দিকে ফিরে তাকাল টেরি, 'কি, বলেছিলাম না, হ্যালোউইনের রাতে খারাপ ব্যবহার করবে না?'

উঠে এল টাকি। তবে ভয় এখনও যায়নি পুরোপুরি। চাপা গলায় বলল, 'কি চালাকি করবে, কে জানে!'

মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল মিসেস জোরোবেল। হাসিটা একই রকম আছে। 'নাও, রবি, তুমি নাও।' কাগজে মোড়া দুটো ক্যান্ডি টেরির হাতে তুলে দিল সে। 'তুমি আবার দাঁড়িয়ে আছো কেন ওখানে, টাকি? এসো, নাও।'

তাড়াতাড়ি বলল টেরি, 'ও টাকি না, বব।'

'ও, হ্যাঁ, বব। নাও।'

টাকির হাতেও একই রকম দুটো ক্যান্ডি ধরিয়ে দিয়ে মহিলা বলল, 'হ্যাপি হ্যালোউইন! তোমাদের পোশাক আমার পছন্দ হয়েছে। ভাল মানিয়েছে ভাঁড়ের পোশাকে। সত্যিকারের ভাঁড় সাজলে আরও ভাল লাগবে।'

ঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজা লাগিয়ে দিল মিসেস জোরোবেল। তালা লাগানোর শব্দ হলো। নিভে গেল হলওয়ের আলো।

'দেখলে তো?' সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে টেরি বলল, 'ডাইনী-টাইনী কিছু না। কোন রকম খারাপ আচরণও করল না।'

'হ্যাঁ, দেখলাম। কল্পনাই করিনি এত ভাল ব্যবহার করবে। যাকগে, বাড়ি চলো এখন। আমার খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেলে ক্যান্ডি খেয়ে নিলেই হয়,' খোয়া বিছানো পথে নেমে এল টেরি। 'পপ কর্নও খেতে পারো। এত সকালে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার। ট্যাটনা শার্লকের দল কি করছে, দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'ওরা আর কি করবে,' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল টাকি। 'আমাদের মতই ক্যান্ডি কুড়াচ্ছে হয়তো।'

মিসেস জোরোবেলের দেয়া ক্যান্ডিগুলো বেশ ভারী। অনুমানেই ভাল মনে হলো টেরির। একটা ক্যান্ডি ব্যাগে রেখে দিয়ে অন্যটার মোড়ক খুলে কামড় বসাল। এক কামড়ে কেটে নিল অর্ধেকটা।

দেখাদেখি টাকিও তাই করল। চকোলেট মেশানো ক্যান্ডি। একবার চিবিয়েই বলে উঠল, 'দারুণ জিনিস দিয়েছে তো! খুব টেস্ট! মাত্র দুটো দিল? গোটা ছয়েক দিলে ভাল হত।'

'যা পেয়েছ, খাও। তুমি তো আসতেই চাইছিলে না।'

'কি ক্যান্ডি, দেখি তো। পরে কিনে খাবো।'

চাঁদের গায়ে মেঘ। আলো কমে গেছে। তবে মোড়কের লেখা পড়া যায়। 'বেস্ট বার,' টেরিকে জানাল সে। 'আসলেই বেস্ট, ঠিক নামই দিয়েছে কোম্পানি।' ক্যান্ডি থেকে কাগজটা পুরো খুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তার পাশে।

মিসেস জোরোবেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগের রাস্তাটা ধরেই ফিরে চলল ওরা। একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দেখল হই-চই করছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। উপহার নিতে এসেছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে টেরি বলল, 'টাকি, ক্যান্ডিটা যখন এতই পছন্দ হয়েছে তোমার, বদলাবদলি করতে পারি। দুটোর বিনিময়ে একটা।'

'কি দেবে তুমি?'

'ক্রাঞ্চ বার।'

'হবে না। একটার বদলে একটা।'

'থাকগে, একটা দিয়ে বদলানোর দরকার নেই। আমারটা আমিই খাব।'

রাস্তার মোড় ঘুরেই তিন গোয়েন্দাকে দেখতে পেল। বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘের

টুকরোটা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

থমকে দাঁড়াল টেরি।

মনে পড়ে গেল মিসেস জোরোবেলের কথা।

হ্যালোউইনের রাত আজ। পূর্ণিমা।

'চাঁদের অসুখ!' বিড়বিড় করল সে।

ক্যান্ডিটা শেষ করে ব্যাগ থেকে ক্যান্ডি কর্নের ব্যাগটা বের করল টাকি। দাঁতে কেটে কোনা ছিঁড়ে ঝরঝর করে মুখের মধ্যে ফেলল। চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

'চাঁদের অসুখ!' শয়তানি হাসি ফুটল টেরির মুখে। 'আমি শিওর, ট্যাটনা শার্লকগুলো সেটাই পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। আর দেখো না, বইখেকোটা তো নেকড়ে-মানব সেজে বসেই আছে। হি-হি-হি!'

'চলো, গিয়ে জিজ্ঞেস করি,' টাকি বলল।

'না, গিয়ে কাজ নেই। ওরা কোন কথা স্বীকার করবে না। বরং ইয়ার্কি মারবে আমাদের। তারচেয়ে নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখি কি ঘটে!'

রাস্তার পাশে সরে এল টেরি। হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। টান দিয়ে মুখোশটা খুলে রাখল ব্যাগের পাশে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' জোরে জোরে কর্ন চিবাতে লাগল টাকি। 'আমি তাকাব না।'

'চুপ! আস্তে! ওদের কানে গেলে বুঝে যাবে তুমি ভয় পেয়েছ।'

'বুঝলে বুঝুক। আমি তাকাচ্ছি না।' অধৈর্য কণ্ঠে টাকি বলল, 'আচ্ছা টেরি, কিশোররা যা করে, সেটাই করার জন্যে পাগল হয়ে যাও কেন তুমি?'

'মজা পাওয়ার জন্যে। যাই বলো না কেন, ট্যাটনা শার্লকটার বুদ্ধি আছে। সব সময় কিছু না কিছু নিয়ে মেতে থাকে।'

চুপ করে চিবাতে থাকল টাকি।

চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল টেরি। মেঘটা সরে গেছে। বেরিয়ে এসেছে আবার ঝকঝকে চাঁদ।

চাঁদের দিকে মিনিটখানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল তিন গোয়েন্দা। হাঁটতে শুরু করল। উল্টো দিকে। ক্রমশ সরে যেতে লাগল টেরিদের কাছ থেকে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে টেরি বলল, 'তাকাচ্ছ না?'

'না,' জবাব দিল টাকি।

'ভয় লাগছে? তারমানে ডাইনী-বুড়ির কথা তুমি বিশ্বাস করেছ?'

'না, করিনি। আর করিনি বলেই তাকাচ্ছি না। ওসব কথা আগেই শুনেছি আমি। সব গাঁজা। ইনডিয়ানরা গুল মারে।...তাকানো তো হলো অনেকক্ষণ। ট্যাটনারাও চলে গেল। চলো এবার, বাড়ি যাই।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল টেরি। 'আজ আমি দেখে ছাড়ব, সত্যি সত্যি খারাপ কিছু ঘটে কিনা। না ঘটলে গুজবটাকে পুঁজি করে ঠকানোর চেষ্টা করব তোতলা মুসাটাকে। ওরা যে ভাবে ঠকিয়েছে আমাকে, আমি ভুলতে পারছি না। শোধটা নিতেই হবে।'

'কিভাবে নেবে?'

'সে দেখা যাবে। আগের কাজ আগে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টাকি। 'কি করতে বলো আমাকে?'

'একটু দাঁড়াও। ভালমত তাকিয়ে নিই।'

'স্রেফ বোকামি করছ। না তাকিয়েও বলে দেয়া যায়, কিচ্ছু হবে না।'

'তাহলে তাকাতে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

'কই পাচ্ছি?'

'ঠিক আছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি পরখ করে নিই।'

'কয় মিনিট?'

'এই, পাঁচ-সাত মিনিট।'

সরাসরি চাঁদের দিকে তাকাল টেরি। তাকিয়েই রইল।

খাওয়া শেষ করে ক্যান্ডি কর্নের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল টাকি। চাঁদের দিকে তাকাল। নেকড়ে-মানব হয় কিনা দেখার কোন ইচ্ছে নেই তার। দেখছে, তার কারণ দেখতে ভাল লাগছে ভরাট চাঁদটা। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। শূন্যে ভেসে থেকে ছুটছে যেন। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

কথা বলছে না কেউ। নড়ছে না।

এক মিনিট...দুই...তিন...

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল টেরির দেহ। মনে হলো চাঁদের ওই সাদা আলো জীবন্ত কিছুর মত ঢুকে পড়ল তার ধমনীতে।

চার

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে টেরি।

ইলেকট্রিক শকের মত।

জড়িয়ে ফেলল যেন তাকে সাদা আলো।

এত উজ্জ্বল! চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছে না। নড়তে পারছে না।

আলোর চাদরের ওপাশে টাকির তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল।

ওকে ডাকার জন্যে মুখ খুলল টেরি। শব্দ বের করতে পারল না।

ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসতে লাগল আলো।

দরদর করে ঘামছে সে। টপ টপ করে শীতল ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মুখ থেকে। ভিজে গিয়ে পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে শার্ট।

ক্ষণিকের জন্যে সব আলো নিভে গেল চোখের সামনে থেকে।

আবার দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করল বাড়িঘর, রাস্তা, গাছপালা।

থরথর করে কাঁপছে সে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। মাথা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে ঘাড়ের কাছে শিরশিরানি তুলছে।

'টাকি…!' অনেক কষ্টে চিৎকারটা বের করল গলা দিয়ে।

অসুস্থ বোধ করতে লাগল।

বড় বড় নখওয়ালা একটা অদৃশ্য থাবা খামচি দিয়ে ধরেছে যেন পেটের মধ্যে। চাপ দিতে আরম্ভ করল। এত জোরে, দম নিতে পারছে না টেরি।

'মা-গো, মরে গেলাম…' ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু। 'আমি আর বাঁচব না…'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। পড়ে যাচ্ছে।

দুলে উঠল মাটি। গর্জন তুলে ছুটে আসতে লাগল যেন তাকে গ্রাস করার জন্যে।

শক্ত, কংক্রীটের রাস্তায় ঠুকে গেল কপাল।

তারপর সব অন্ধকার।

*

চোখের পাতা মিটমিট করল টেরি। একবার। দু'বার।

জেগে উঠল সে।

মাথা সোজা করার চেষ্টা করল। চোখের পাতা খুলল। চোখ মিটমিট করল উজ্জ্বল আলোতে।

সূর্যের আলো!

কোথায় রয়েছে সে?

চিৎ হয়ে আছে। জানালার দিকে তাকিয়ে। গাঢ় রঙের পর্দার অনেকখানি করে দুই পাশে টেনে দেয়া। কাঁচে প্রতিফলিত হচ্ছে কমলা রোদ।

সকালের রোদ।

পেশিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে। নড়ানোর চেষ্টা করল। দুই হাত মাথার ওপর টানটান করে দিল। বাড়ি লাগল খাটের তক্তায়।

বিছানায় রয়েছে।

নিজের বিছানায়। বাড়িতে।

সকাল হয়ে গেছে। নিজের বিছানায় নিরাপদে শুয়ে আছে সে। কোন সমস্যা নেই।

বাড়ি ফিরল কখন? মনে করতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই কি স্বপ্ন

ছিল?

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!

চমৎকার সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

হাসতে ইচ্ছে করছে। অট্টহাসি। আনন্দে ফেটে পড়তে মন চাইছে।

সবই ছিল দুঃস্বপ্ন!

জোরে দম নিতে নিতে উঠে বসতে গেল সে।

চোখ পড়ল বিছানার চাদরের দিকে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেল। ফাঁক হলো বটে মুখ, কিন্তু শব্দ বেরোল না।

পাঁচ

চাদর! বালিশ! চিরে ফালাফালা!

নখের আঁচড়ে ছিঁড়েছে ওরকম ভাবে।

চিৎকার করে উঠল সে। খসখসে শব্দ বেরোল গলা থেকে।

কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল সে। তাকিয়ে রইল ছেঁড়া চাদর আর বালিশের দিকে।

বালিশের খোলে কি লেগে আছে ওগুলো?

কালো, খাটো খাটো চুল। লোম!

কালো লোমে বালিশের কাপড় ছেয়ে আছে। চাদরে লোম ভর্তি।

হলো কি বিছানাটায়?

কি ঘটল? কোন দানব ঘুমিয়েছিল নাকি!

নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। কাঁপা কাঁপা, সর্দি লাগার মত শব্দ।

রোদের আলো চোখে লাগছে খুব। চোখ মিটমিট করল সে। আতঙ্কিত। চোখের পাতা কাঁপতে লাগল বিছানার দিকে তাকিয়ে।

সব যেন গোলমেলে। গণ্ডগোল হয়ে আছে সব কিছুতে।

কি ঘটেছিল?

হালকা নীল কার্পেটে ধুলোমাখা বড় বড় পায়ের ছাপ। এগিয়ে গেছে দরজা থেকে বিছানা পর্যন্ত।

জন্তুর পায়ের ছাপ।

আবার কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে উঠল সে। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। খসখস শব্দে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে হাঁ করা মুখ থেকে। দেয়ালে লাগানো আয়নার দিকে এগোল টলতে টলতে।

আতঙ্কিত হয়ে তাকাল আয়নার ভেতরে।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল ভয়াবহ এক দানবের দিকে।

মাথার চুল আগের মতই আছে। কিন্তু তার নিচে গজিয়েছে নেকড়ের মত লম্বা এক মুখ। কালো চকচকে নাক। চোয়াল ফাঁক করতেই বেরিয়ে পড়ল দুই সারি হলদেটে দাঁত। জানোয়ারের দাঁত।

হাত উঁচু করল। বাহু দুটো মানুষের মতই আছে। হাতের থাবাও মানুষের মত। তবে পেছন দিকটা লোমে ভরা। খাড়া খাড়া কালো লোম।

ঘাড়ের পেছনটাও ছেয়ে গেছে একই রকম লোমে। পিঠে লোম।

চোখ দুটোতে কেবল তেমন কোন পরিবর্তন নেই। আগের মতই আছে। তবে টকটকে লাল হয়ে আছে সারারাত না ঘুমানো মানুষের মত।

বাকি সব কিছু দানবীয়, কুৎসিত।

চাঁদের অসুখ!

সত্যি। সব সত্যি।

মিথ্যে বলেনি ডাইনী বুড়িটা।

চাঁদের অসুখে ধরেছে ওকে। বুঝতে পারছে টেরি।

হ্যালোউইনের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। সাদা জ্যোৎস্না স্রোতের মত বয়ে গিয়েছিল ওর দেহের ওপর দিয়ে। ধরবেই তো অসুখে।

টাকি?

টাকিকেও কি ধরেছে?

কাল রাতে এ বাড়িতেই তার থাকার কথা। টেরিদের বাড়িতে। টাকির বাবা-মা দীর্ঘদিনের জন্যে ইয়োরোপ চলে গেছেন। কাজেই নিরালা, একলা বাড়িতে ফেরার কোন তাগাদা নেই টাকির।

টেরির বাবাও বাড়ি নেই। ইটালি গেছেন। ব্যবসার কাজে। মা তো বহু আগেই ওর বাবাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

জানোয়ারের মত গোঁ গোঁ করে উঠল আবার টেরি। নাকের ফুটো দিয়ে সর্দি ঝরছে। পেটে জানোয়ারের খিদে। জানোয়ারের মতই ঝটকা দিয়ে দুলে দুলে সরে এল আয়নার কাছ থেকে।

দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়েই আছে, তবে স্বাভাবিক মানুষের মত সোজা হতে পারছে না। পিঠ সামান্য কুঁজো। খাটের কিনার দিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁকা হাঁটু বাড়ি লাগল খাটের মশারি স্ট্যান্ডের সঙ্গে। রাগে গর্জন করে উঠল জানোয়ারের মত।

পড়ে যাচ্ছিল। বিছানার কিনার খামচে ধরল। নখ লেগে চিরে ফালাফালা হলো বিছানা।

নবে মোচড় দিয়ে দরজা খোলার সময় আঁচড় লাগল কাঠের পাল্লায়। দুলতে দুলতে হলঘরে বেরোল সে।

গোঁ গোঁ করছে। হাঁপাচ্ছে।

কট্ কট্ করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে। নতুন চোয়ালে অভ্যস্ত হতে পারেনি এখনও। হলের মেঝেতে বিছানো কার্পেটে ঘষা লাগছে পায়ের নখ। থপ্ থপ্ শব্দ হচ্ছে পা ফেলার সময়।

এক হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চলল সে। নখ লেগে কেটে যাচ্ছে দেয়ালের কাগজ।

গেস্টরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। টাকির যেখানে থাকার কথা।

ওকেও কি ধরেছে অসুখটায়? চাঁদের অসুখে?

রোমশ একটা হাত উঁচু করল সে। থাবা দিল দরজায়।

ছয়

জবাব না পেয়ে আরও জোরে থাবা মারল টেরি। মড়মড় করে উঠল দরজার কাঠ।

হাতের দিকে তাকাল। কুৎসিত, লোমে ঢাকা হাতে জানোয়ারের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

টাকি! টাকি! বলে ডাকার চেষ্টা করল টেরি। কিন্তু স্পষ্ট হলো না উচ্চারণ। কেমন একটা অং-অং শব্দ মিশে যাচ্ছে মুখ দিয়ে বেরোনোর সময়।

ভেন্তর থেকে সাড়া দিল টাকি। তার উচ্চারণেও অং-অং মেশানো।

সর্বনাশ!

চোখ বুজে এল টেরির। ওকেও ধরেছে! টাকিও চাঁদের অসুখে আক্রান্ত হয়েছে!

'দরজা খোলো! ভেতরে ঢুকব!' টেরি বলতে চাইল। কিন্তু জানোয়ারের জিভ তার এখন, ভারী হয়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। লম্বা চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। কথা স্পষ্ট হচ্ছে না আরও সেজন্যে। এই মুখ নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। 'আমাকে ঢুকতে দাও!'

তবু দরজা খুলল না টাকি।

'যাও! যাও!' কানে এল জানোয়ারের মত চিৎকার। ব্যথা-ভরা আর্তনাদ।

'না, আমি যাব না!' গুঙিয়ে উঠল টেরি।

লোমে ঢাকা মুঠো তুলে ক্রমাগত কিল মারতে থাকল টেরি। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। এমন সহজে ভেঙে গেল কাঠের দরজাটা, যেন মলাটের তৈরি। বিশাল পা দিয়ে লাথি মেরে ভাঙা কাঠ সরিয়ে ভেতরে

ঢুকল সে।

আয়নার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টাকি। ফিরে তাকাল টেরির দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি। কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে। সমস্ত শরীরেই পরিবর্তন ঘটেছে, কেবল চোখ দুটো বাদে।

লোমশ ভয়ানক বাহু দুটো মাথার ওপর তুলে ঝাঁকি মারল টাকি। গর্জন করে উঠল রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে।

আরেকবার গর্জে উঠে ঝাঁপ দিল টেরিকে লক্ষ্য করে। উড়ে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। দুই হাতে ঘুসি মারতে লাগল টেরির বুকে।

'তোমার দোষ! সব তোমার দোষ!' আধা-দুর্বোধ্য উচ্চারণে বার বার একটা কথাই বলছে টাকি।

মনে মনে নিজের দোষ মেনে নিতে বাধ্য হলো টেরি। তার গোয়াতুর্মিতেই এই অঘটনটা ঘটল। কিন্তু কি করে জানবে, ডাইনী বুড়িটা ঠিক কথাই বলেছিল? কি করে বুঝবে, 'চাঁদের অসুখ' বলে সত্যি সত্যি একটা অসুখ আছে? নিজেদের হয়েছে। তাই এখন বুঝতে পারছে।

ধাক্কা দিয়ে টেরিকে মাটিতে ফেলে দিল টাকি। বুকের ওপর চেপে বসে কিল-ঘুসি মেরে চলল সমানে। জন্তুর মত গরগর করছে। দাঁত কিড়মিড় করছে।

ঠেলে ওকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল টেরি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টাকি। টেনে তুলল টেরিকে। ঠেলে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলল দেয়ালের গায়ে।

চিৎকার করে উঠল টেরি। রাগ হয়ে গেল তারও। ঝাড়া মেরে টাকির হাত ছুটিয়ে নিয়ে সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি, মারামারি। পুরো বুনো জানোয়ারের মত।

ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল বিছানার পাশের টেবিলটা। ধড়াস করে বিকট আওয়াজ হলো।

প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে গিয়ে যুদ্ধ-বিরতি দিল দুজনে।

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেরি। দুই থাবা হাঁটুতে রেখে ভর দিয়ে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

টাকিও হাঁপাচ্ছে। কোনমতে বলল, 'কি করব!'

তাই তো! কি করবে? এতক্ষণে ভাবল টেরি। কি করবে ওরা?

মাথা নাড়ল সে। জানে না।

'জোয়ালিন!' উত্তেজিত হয়ে বলতে গিয়ে গর্জন বেরিয়ে এল টাকির মুখ থেকে।

ঠিক। টেরিদের বাড়িতে কাজ করে জোয়ালিন। ঘর দেখাশোনা, রান্নাবান্না, সব। তাকে বোঝাতে হবে, ওদের অসুখ করেছে। এ ছাড়া আর

করবেই বা কি?

যে কোনভাবেই হোক, বোঝাতেই হবে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ওরা নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে।

ভাল হতে হলে তৃতীয় কারও সাহায্য লাগবে এখন।

দরজার দিকে রওনা দিল টেরি। পিছু নিল টাকি। ভাঙা দরজার কাঠ মাড়িয়ে বেরিয়ে এল হলে।

শিম্পাঞ্জির মত কুঁজো হয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করল দুজনে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। দম নেয়ার শব্দ হচ্ছে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত।

দানবীয় শরীর দুটোকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল ওরা।

'জোয়ালিন!' চিৎকার করে ডাকল টেরি।

দরজার দিকে পেছন করে রান্নাঘরের সিংকে কাজ করছে জোয়ালিন। আবার ডাকল টেরি, 'জোয়ালিন!'

সাত

উদ্ভট কণ্ঠ শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জোয়ালিন।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ।

হাত থেকে খসে পড়ে গেল কফির কাপ। যেটা ধুচ্ছিল। ঝনাৎ করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভেতরে ছিল বাদামী পানি, ছড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে।

'তো-তো-তোমরা কে!' ভয়ে তোতলানো শুরু হয়ে গেল জোয়ালিনের।

'জোয়ালিন···আমি!' বোঝানোর চেষ্টা করল টেরি। রোমশ হাতটা সামনে বাড়িয়ে নাড়তে গেল মানুষের মত, কিন্তু বন্য আচরণ শুরু করল ওটা। জিভটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে কথা বলতে গিয়ে, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসছে ফুসফুস থেকে। এ এক ভয়ানক পরিস্থিতি। কথাগুলো শোনাচ্ছে খসখসে।

আচমকা সংবিত ফিরে পেল জোয়ালিন। আতঙ্কে সে-ও প্রায় জানোয়ারের মতই চিৎকার করে উঠল, 'ভাগো! ভাগো!' থরথর করে কেঁপে উঠল দেহ। 'ভূত-প্রেত-দানব যা-ই হও তোমরা, দয়া করে যাও এখান থেকে!'

কাউন্টারের দিকে পিছিয়ে গেল সে। আচমকা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ঝুল ঝাড়ার ঝাড়ু। টেরি আর টাকির দিকে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'বেরোও! জলদি

বেরোও!'

বেরোচ্ছে না দেখে চেঁচাতে শুরু করল, 'ভূত! ভূত! দানব! কে আছো! বাঁচাও!'

'জোয়ালিন!'

বোঝানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল টেরি। ওরা ভূত নয়, টেরি আর টাকি, বোঝাতেই হবে। বলতে হবে চাঁদের দিকে তাকানোতেই তাদের এই অবস্থা।

'ভয় পাচ্ছ কেন, জোয়ালিন! আমরাই তো···আমি টেরি। ও টাকি!' বলতে চাইল টেরি। 'ভয় পেয়ো না। আমরা দৈত্যও নই, বুনো জানোয়ারও নই। আমাদের সাহায্য করো তুমি।'

কিন্তু এত কথা বেরোল না টেরির মুখ থেকে। যা বলতে পারল, তাতে চিৎকার আরও বেড়ে গেল জোয়ালিনের। কানে লাগছে টেরির। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঝাড়ু ঘুরিয়ে বাড়ি মারল জোয়ালিন। ডাণ্ডাটা লাগল টেরির পেটে।

গার্‌র্‌র্! গার্‌র্‌র্! ভয়ানক রাগে গর্জন বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে।

ঝাড়ুর ডাণ্ডাটা দুই হাতে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল জোয়ালিনের হাত থেকে। হাঁটুতে বাড়ি মেরে দুই টুকরো করে ফেলল।

টাকি গিয়ে থাবা মেরে ফেলে দিতে লাগল টেবিলে রাখা বাসন-প্লেট, কাপ-পিরিচ। মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙতে লাগল ওগুলো। গ্লাসগুলো এক এক করে তুলে নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সে।

রাগ দমন করতে পারছে না দুজনের কেউই। বুঝতে পারছে সেটা টেরি।

পুরোপুরি জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

চিৎকার বন্ধ করল জোয়ালিন। হাঁ করে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। কাঁপছে। কাউন্টারের কিনার চেপে ধরেছে দু'হাতে। আতঙ্কে ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল।

'প্লীজ···' জোরে বলার সাহস পাচ্ছে না আর জোয়ালিন।

একটা কাঁচের কেবিনেটে ঘুসি মারল টাকি। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ।

'জোয়ালিন! আমাদের সাহায্য করো!' চিৎকার করে বলতে চাইল টেরি। 'নিজেদের আমরা সামলাতে পারছি না। জিনিস ভাঙতে চাই না আমরা। কিন্তু কোনমতেই ঠেকাতে পারছি না নিজেকে।'

কিন্তু এ সব কোন কথাই বলতে পারল না সে। বরং ভয়ানক আরেকটা গর্জন বেরিয়ে এল লম্বা মুখের ভেতর থেকে।

কাউন্টারের ধার ধরে সরে যেতে শুরু করল জোয়ালিন। 'প্লীজ···'

বিড়বিড় করে অনুরোধ করছে, 'প্লীজ! চলে যাও!'

দেয়াল থেকে ছোঁ মেরে খুলে আনল রিসিভার। টিপে দিল তিনটে বোতাম।

'পুলিশ!' চিৎকার করে উঠল রিসিভার কানে ঠেকিয়ে। 'পুলিশকে দিন! জলদি!'

প্রচণ্ড রাগ টগবগ করে ফুটে উঠতে লাগল টেরির মধ্যে। লাফাতে লাফাতে ছুটল। রাগে অন্ধ লাল চোখে সব কিছুই ধোঁয়াটে দেখছে এখন।

জোয়ালিনের হাত থেকে টান মেরে কেড়ে নিল রিসিভারটা। হ্যাঁচকা টানে দেয়াল থেকে তারসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এল।

চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল জোয়ালিন।

রিসিভারটা দেয়ালে আছড়ে ফেলল টেরি।

নিয়ন্ত্রণহীন। নিজের ওপর একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে।

শুধুই রাগ। প্রচণ্ড রাগ শক্ত করে দিয়েছে মাংসপেশিকে, দাঁত কিড়মিড় করাচ্ছে, গলা দিয়ে বের করে আনছে চাপা গর্জন।

রাগই এখন তার মগজকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। চাপা শিসের মত শব্দ করে বাতাস বেরোচ্ছে নাক দিয়ে।

রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলে ফেলেছে টাকি। টান মেরে পাল্লাটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

পালাতে হবে এখান থেকে, বুঝতে পারছে টেরি।

এ ভাবে রান্নাঘরটা ধ্বংস করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া যে আচরণ করছে ওরা, সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। জোয়ালিনকেও জখম করে বসতে পারে।

সে রকম কিছু ঘটতে দেয়া ঠিক হবে না।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল টেরি। সামনে যা পড়ছে, তাতেই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। রেফ্রিজারেটরের কাছ থেকে টাকির হাত ধরে টান দিল।

রাগ করে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল টাকি। সন্দিহান চোখে তাকাল।

জোর করে তাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল টেরি।

কয়েক সেকেন্ড পরেই পেছনের আঙিনা ধরে ছুটল দুজনে। শরীর খুব ভারী লাগছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে, দুই হাত ঝুলিয়ে মাটির ওপর দিয়ে প্রায় টেনে নিয়ে চলল নিজের দেহটা।

পেটে খিদের গর্জন। ভয়াবহ খিদে।

একটু আগেও রোদ ছিল। এখন মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে কালো

মেঘের দল। ওদের তপ্ত মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া।

দৌড়াতে ভাল লাগছে। পরিশ্রম ওদের রাগ কমাতে সাহায্য করছে।

গোঁ গোঁ, গর্গর্ করতে করতে পাশাপাশি ছুটল ওরা। মানুষের নজরের আড়ালে থাকতে চাইছে। সেজন্যে পাতাবাহারের বেড়ার ধার ঘেঁষে মাথা নুইয়ে চলেছে।

কোথায় যাবে? কি করবে?

কোন ধারণা নেই। স্পষ্ট ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। কোন বুদ্ধি বের করতে পারছে না।

শরতের ঝরা পাতার কার্পেট বিছানো মাটিতে। সে-সব মাড়িয়ে, একটা ছোট ঝোপ ডিঙিয়ে, রাস্তা পার হয়ে চলে এল অন্য আরেকটা ব্লকে।

কয়েকটা বাড়ি পরে, রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে।

চট করে আড়ালে সরে গেল দুজনে। দেখতে পেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে ছেলেমেয়েগুলো।

কি করবে বুঝতে পারছে না ওরা। দুটো আধা-বুনো জন্তুর মত দৌড়ে পালাতে শুরু করল। মানুষ দেখলেই পালানো! কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

সমস্যা আরও আছে। যতই দৌড়াচ্ছে, খিদে বাড়ছে। ভয়াবহ, রাক্ষুসে খিদে। মানুষ যখন ছিল, তখন এমন ছিল না।

পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। মোচড় দিচ্ছে। বার বার পেট খামচে ধরছে যেন তীব্র খিদে। খাবার ছাড়া আর কোন কথা ভাবতে পারছে না।

খেতে হবে। যে কোন ভাবেই হোক, খাবার জোগাড় করতে হবে।

নির্জন জায়গায় সরে এসে গতি কমিয়ে দিল টেরি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে লম্বা জিভ ঝুলে পড়েছে।

একটা গাছের গোড়ার দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল তার। একজোড়া কাঠবিড়ালী।

দেখার পর একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুটো কাঠবিড়ালীর ওপর। মানুষ হয়ে যে কাজটা কোনমতেই করতে পারত না, সেটাই করে ফেলল অবলীলায়। দুই হাতের নখ দিয়ে চেপে ধরে ফেলল কাঠবিড়ালী দুটোকে। নিজেদের ক্ষিপ্রতা দেখে অবাক হলো।

ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল টাকি। দুজনে মিলে চোখের পলকে ছিঁড়ে ফেলল কাঠবিড়ালীটাকে। খেয়ে শেষ করে ফেলল। হাড়গুলোও চেটেপুটে ঝকঝকে করে ফেলল।

একটা অদ্ভুত দুঃখবোধ চেপে ধরল টেরিকে। জ্যান্ত কাঠবিড়ালী ছিঁড়ে কাঁচা মাংস খেয়েছে—যতই ভাবল কথাটা, দুঃখে জর্জরিত হতে থাকল মন।

পুরোপুরি জন্তুতে পরিণত হয়েছে দুজনে!

আট

ঠবিড়ালী দুটোকে খাওয়ার পর ক্ষুধা সামান্য কমল। চিন্তা-ভাবনা শুরু করল আবার। কি করা যায়? কিভাবে রোগ সারাবে?

দুজনেই একমত হলো, অন্য কারও সাহায্য দরকার।

কার সাহায্য?

হ্যারল্ড। ওর বড় ভাই আছে। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে হাসপাতালে, বা চিকিৎসার জন্যে যেখানে যেতে চায়, সেখানে।

চিকিৎসাটা কোথায় হবে?

সেটা পরে ভাবা যাবে। হ্যারল্ড সাহায্য করতে রাজি হলে ওর বড় ভাইই পরামর্শ দিতে পারবে, কোথায় যাওয়া যায়।

কিন্তু হ্যারল্ড কি রাজি হবে? না হওয়ার কিছু নেই। হ্যারল্ড ওদের বন্ধু।

হ্যারল্ডদের বাড়ি ওখান থেকে কয়েক ব্লক দূরে। যাওয়ার সময় কার চোখে পড়ে যাবে, হট্টগোল শুরু হবে, ঠিক নেই। তবু যেতেই হবে।

গাছপালা, পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল দুজনে। চোরকাঁটা, শুকনো পাতা আটকে যাচ্ছে লোমের মধ্যে, কেয়ারই করছে না ওরা।

নিরাপদেই হ্যারল্ডদের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে দুজনে। খিদে টের পেল টেরি। আবার মোচড় দিতে শুরু করেছে পেট। পুরোপুরি ভরাতে ক'টা কাঠবিড়ালী লাগবে!

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আপনাআপনি চাপা গর্জন বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে। হতাশার। কাজে যাচ্ছেন হ্যারল্ডের বাবা মিস্টার বাকসন। হ্যারল্ড বসে আছে গাড়িতে। তাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় চলে যাবেন মিস্টার বাকসন।

অল্পের জন্যে হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারল না ওরা।

'স্কুলে গিয়ে দেখা করব!' বিকৃত উচ্চারণে চিৎকার করে উঠল টেরি।

জোরে জোরে নেকড়ে-মাথাটা নাড়তে নাড়তে টাকি বলল, 'হবে না। ছেলেমেয়েরা দেখলে ভয় পাবে। চেঁচামেচি করে বিপদে ফেলে দেবে আমাদের।'

ঠিকই বলেছে টাকি। হতাশায়, রাগে পেটের মধ্যে আবার খামচি দিয়ে ধরতে আরম্ভ করল টেরির।

কি বিপদেই না পড়ল!

অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও স্বাভাবিক মানুষ ছিল ওরা। এখন পুরোপুরি দানব!

ইস্, কেন যে বোকামিটা করতে গেল! জিপসি বুড়ির কথা অবিশ্বাস করে চাঁদের দিকে তাকাল!

মনে পড়ল তিন গোয়েন্দার কথা। ওরাও তাকিয়েছিল চাঁদের দিকে। তবে কি ওরাও নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে?

তুড়ি বাজাতে গেল টেরি। কিন্তু বড় বড় নখওয়ালা আঙুল দিয়ে বাজানো সম্ভব হলো না। উত্তেজিত হয়ে টাকির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিশোররাও তাকিয়েছিল!'

টাকিও উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ঠিক! ওদেরও নেকড়ে হয়ে যাওয়ার কথা। চলো, গিয়ে দেখি ওদের অবস্থা। ট্যাটনাটা নেকড়ে হলে আমাদের জন্যে সুবিধে। ভাল হওয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা সে করেই ফেলবে।'

'কিন্তু আগে খাওয়া দরকার,' টেরি বলল। 'পেটের মধ্যে যে ভাবে মোচড় দিচ্ছে...'

কিন্তু কি খাবে?

ছোট একটা জংলামত জায়গায় এসে ঢুকল ওরা। ঝোপঝাড়ের নিচে মাটিতে আর ডালপালায় প্রচুর পোকা-মাকড় দেখতে পেল। মহানন্দে সেগুলোই খাওয়া শুরু করে দিল। মানুষ থাকাকালে যে জিনিস চোখে দেখলেও গা গোলাত, সেগুলোই হয়ে উঠল এখন সুস্বাদু খাবার।

পোকা-মাকড়, পাখির ডিম, এমনকি একটা বাসা থেকে সদ্য ফোটা পাখির ছানাও গোগ্রাসে গিলে ফেলল ওরা। পেট কিছুটা ঠাণ্ডা হতে রওনা হলো কিশোরদের বাড়ির দিকে।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। হ্যারল্ডদের পরের ব্লকের একটা বাড়ির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একজন লোকের সামনে পড়ে গেল। গ্যারেজের সামনে গাড়ি ধুচ্ছিল সে। যতই বোঝানোর চেষ্টা করল দুজনে, ওরা মানুষ, দানব নয়, কিছুতেই বুঝল না লোকটা। শেষে একটা শাবল তুলে নিয়ে বাড়ি মেরে বসল টাকিকে। বাড়িটা ঠিকমত লাগলে মাথা ফেটে যেত টাকির। লাগেনি, রক্ষা। বাধ্য হয়ে শেষে লোকটার হাতে কামড়ে দিল টেরি।

কামড় খেয়ে ছুটে পালাল লোকটা। বাড়ির ভিতর গিয়ে পুলিশকে ফোন করল।

ব্লকটা পেরোনোর আগেই পুলিশের সাইরেনের শব্দ কানে এল ওদের।

ঘিরে ফেলল পুলিশ। দেখে ফেলল দুজনকে। ধাওয়া করল।

তাড়া খেয়ে আর কোন উপায় না দেখে একটা ম্যানহোলে ঢুকে পড়ল দুজনে।

'শেষে নর্দমা!' রাগে, দুঃখে চিৎকার করে উঠল টেরি।

'চুপ!' সাবধান করল টাকি। ম্যানহোলের ঢাকনাটা নামিয়ে দিয়ে, বাঁচার জন্যে নর্দমার আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল।

মাথার ওপরে ভারী বুট পরা পায়ের ছোটাছুটির শব্দ। হই-চই, চিৎকার, হট্টগোল।

ভয়াবহ দুর্গন্ধ ভেতরে!

আলোও নেই। গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু ওদের চোখের ক্ষমতা বেড়ে গেছে এখন। আসল নেকড়ের মত অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে।

কানে আসছে পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ। বদ্ধ জায়গায় বিশ্রী, বিরক্তিকর লাগছে শব্দটা।

তবে এরই মাঝে উত্তেজক আরেকটা শব্দ কানে এল।

বড় ইঁদুরের তীক্ষ্ণ কিঁচকিঁচ।

ধমনীর রক্ত ঝলকে উঠল ওদের।

খাবার! লোভনীয় খাবার!

নয়

শপাশটা দেখতে লাগল টেরি। পাকা ড্রেন। কংক্রীটের দেয়াল। নিচে ময়লা পানির তীব্র স্রোত।

'এখানে থাকতে মোটেও ভাল লাগছে না আমার!' রোমশ পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে বসে ঘোষণা করল টাকি।

মাথার ওপরে পুলিশের বাঁশি, চিৎকার-চেঁচামেচি চলছেই।

'উপায় নেই,' টেরি বলল। 'এখানেই থাকতে হবে আমাদের। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত, হ্যারল্ড না আসা পর্যন্ত।'

'কিশোরদের বাড়ি যাবে না?'

'যাব। স্যালভিজ ইয়ার্ডটা তো অনেক দূর। যেতেই যখন পারলাম না, আগে হ্যারল্ডের সঙ্গেই কথা বলি।'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে চলে গেল পুলিশ।

পেটের মধ্যে জ্বলে উঠছে আবার ক্ষুধার আগুন। নর্দমার মধ্যেই খাবারের খোঁজ করতে লাগল দুজনে।

নানা রকমের পোকা আর আরশোলার অভাব নেই। সেগুলোই ধরে ধরে খেতে শুরু করল। বেশির ভাগই বাজে স্বাদ। কিন্তু খিদের তাড়নায় ভালমন্দ বাছবিচারের মধ্যে গেল না।

নর্দমায় ভেসে যাওয়া ফুলে ওঠা একটা মরা ইঁদুর দেখে হাতে যেন চাঁদ

পেল টাকি। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে মুখে পুরে ফেলল।

করুণ দৃষ্টিতে টাকির দিকে তাকিয়ে টেরি বলল, 'এক্কেবারেই জন্তু হয়ে গেলাম আমরা! কি সব খাচ্ছি, দেখো!'

রাগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল টাকির মগজে। 'সব তোমার দোষ!'

নর্দমার মধ্যে আর ঝগড়াঝাঁটি বাধাতে চায় না টেরি। তাড়াতাড়ি বলল, 'চিন্তা নেই। হ্যারল্ড আমাদের সাহায্য করবে। একটা ব্যবস্থা সে করবেই।'

ওপরে, বাইরেটা এখন পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে।

নর্দমার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল দুজনে। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কালো রঙের ভয়াবহ নোংরা পানি। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে বিষাক্ত, পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে গিয়ে।

অপেক্ষা করে রইল ওরা।

সাড়ে তিনটার কিছু পরে আস্তে আস্তে এগোল ম্যানহোলটার দিকে। খুব সাবধানে ঠেলা দিয়ে ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল টেরি। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। আবার মেলল। ধীরে ধীরে চোখে সইয়ে নিল আলো। বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ম্যানহোলের ওপর।

ঢাকনা তুলে উঠে এল দুজনে। লোকজন নেই আশেপাশে। বাতাস ঠাণ্ডা। গায়ে রোদের উত্তাপটা ভাল লাগছে ওদের।

লাথি মেরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল টেরি। নিজের শক্তি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। মানুষ থাকতে লোহার ঢাকনায় এ ভাবে লাথি মারলে নির্ঘাত গোড়ালি মচকাত।

গাছপালার আড়ালে আড়ালে রাস্তার মোড়ে চলে এল দুজনে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল। এ পথ দিয়েই যাবে হ্যারল্ড।

প্রথম গেল দুটো ছেলে-মেয়ে।

তারপর দল বেঁধে এল বাকিরা। তাদের মাঝে হ্যারল্ডকে দেখে দমে গেল টেরি আর টাকি। একা না পেলে কথা বলা যাবে না।

ফিসফিস করে টেরি বলল, 'হ্যারল্ডদের বাড়ির কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে।'

গাছপালা আর পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে থেকে আবার ছুটল দুজনে। হ্যারল্ডের আগেই ওদের বাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।

ওরা এখন জানোয়ার। মানুষের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে। হ্যারল্ড আসার অনেক আগে এসে বসে রইল ওদের বাড়ির সামনের লনের কিনারে, ঝোপের মধ্যে।

'এদিক দিয়ে যদি না আসে?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল টাকি। বার বার বিফল হয়ে বেশি আশা করতে ভয় পাচ্ছে সে।

'এদিক দিয়েই আসবে,' টেরি বলল। 'সামনের গেট দিয়ে। পেছনে যাবার কোন কারণ নেই।'

'যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করে?'

'করাতে হবে।'

'চিনতে পারবে তো?'

'প্রথমে তো পারবেই না। আসুক। দেখা যাক। ও আমাদের বন্ধু। বুঝিয়ে বললে একটা ব্যবস্থা করবেই সে।'

'বলার সুযোগ দিলে, তবে তো। দেখেই যদি দৌড় মারে?'

'ওই যে, আসছে সে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল টেরি।

শিস দিতে দিতে হেলেদুলে হেঁটে আসছে হ্যারল্ড। একা। হাঁটার তালে তালে ঝাঁকি খাচ্ছে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ।

গেট দিয়ে ঢুকল হ্যারল্ড। এগিয়ে আসতে লাগল ড্রাইভওয়ে ধরে।

'হ্যারল্ড!' বলে বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল টাকি।

টেরিও বেরিয়ে এল।

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যেন হ্যারল্ড।

আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেল মুখ।

বেল্ট থেকে ঢিল হয়ে গেল আঙুলগুলো। ব্যাগটা খসে পড়ে গেল কাঁধ থেকে।

'হ্যারল্ড!' আবার চিৎকার করে বলল টাকি। 'আরে, আমি! আমি টাকি। ও টেরি।'

এতক্ষণে চিৎকার বেরোল হ্যারল্ডের মুখ থেকে।

তারপর আচমকা পাশ কাটিয়ে দিল দৌড়।

যতই পেছন থেকে চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করল টেরি আর টাকি, শুনল না হ্যারল্ড। দাঁড়ালও না। সোজা বাড়িতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল।

আধ মিনিট পর বাড়ির ভেতর থেকে হই-চই শোনা গেল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বন্দুকের নল। ধুড়ুম করে গুলির শব্দ হলো। শটগান দিয়ে ওদের গুলি করার চেষ্টা করছে হ্যারল্ডের ভাই।

ভাগ্য ভাল, ছররাগুলো লাগল না টেরি বা টাকির গায়ে।

আর দাঁড়াল না ওরা ওখানে। দৌড় দিল রাস্তার দিকে। গুলি খেয়ে মরতে চায় না।

কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করা হয়েছে হ্যারল্ডদের বাড়ি থেকে।

হ্যারল্ডের ওপর মনটা বিষিয়ে গেল টেরির। হাতের কাছে পেলে এখন নখ দিয়ে ছিঁড়ত।

বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না। নিজেদের প্রাণ বাঁচানো জরুরী হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা আবার সেই ম্যানহোলের মধ্যে আত্মগোপন।

দশ

দুই দুই বার ফোন পেয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেছে পুলিশ। ওদের বাঁশি আর পদশব্দ থেকে থেকেই শোনা যেতে লাগল। বেরোনোর সুযোগ পাচ্ছে না টেরিরা।

মাঝরাতের পরে শব্দ থেমে গেল। তারপরেও বেরোল না ওরা। আরও সময় যাক।

ভোরের ঘণ্টাখানেক আগে সাবধানে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার মোড়ে পুলিশ দেখতে পেল। তারমানে মোড়ে মোড়ে কড়া পাহারা বসিয়েছে। এ অবস্থায় স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাওয়াও নিরাপদ নয়। একটা জায়গার কথাই মনে পড়ল ওদের–মুসাদের বাড়ি। বনের কিনারে ওদের বাড়ি। ওদিকটায় বাড়িঘর বিশেষ নেই। পুলিশও অত দূর যাবে বলে মনে হয় না।

রাতের অন্ধকারে নিজেদের রোমশ শরীরটাকে আড়াল করে এগিয়ে চলল দুজনে।

রাস্তার পাশে লম্বা লম্বা ঘাস। সেগুলোর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে খুব সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগল। গাড়ি আসতে দেখলে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে টাকি বলল, 'যদি মুসাদের বাড়িতেও পুলিশ ডাকে?'

'এবার ডাকলে আর পালাব না,' হাল ছেড়ে দিয়েছে টেরি। 'ধরে নিয়ে যায়, যাক। আমরা তো আর কোন অপরাধ করিনি।'

'নিয়ে গিয়ে যদি চিড়িয়াখানায় ভরে রাখে? রাস্তাঘাটে কোন জানোয়ারকে ছাড়া দেখলে তাই তো করে ওরা।'

'কপালে যদি থাকে চিড়িয়াখানা, কি আর করব!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল টেরি। 'মানুষের আনন্দের খোরাক হব!'

একটা গাড়ি আসতে দেখে মাথা নামিয়ে ফেলল দুজনে। ওদের পাশ দিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল গাড়িটা।

পুলিশের গাড়ি নাকি!

'সর্বনাশ!' ঠাণ্ডা মাটিতে পেট ঠেকিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল টাকি। 'দেখে ফেলেছে আমাদের!'

'চুপ! কথা বোলো না!' লোমে ছাওয়া বুকের গভীরে ধড়াস ধড়াস বাড়ি মারছে টেরির হৃৎপিণ্ড।

তবে গাড়ি থেকে নামল না কেউ। কয়েকটা সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে

চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাথা তুলল টাকি। 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!'

আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়িটার ব্রেক কষার কারণ বুঝতে পারল।

বড় একটা খরগোশ মরে পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। চাকার চাপে ভর্তা হয়ে গেছে।

খিদে যেন লাফ দিয়ে উঠল দুজনের পেটে। দৌড়ে গিয়ে রক্তাক্ত খরগোশটা তুলে নিল টেরি। এখনও গরম।

টাকির দিকে তাকাল টেরি, 'খাবে?'

খাবে না মানে!

মরা খরগোশটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনে। দাঁত আর নখ দিয়ে ছিঁড়ে খেতে শুরু করল।

একটা খরগোশে কিছুই হলো না ওদের। ছ'টা দিলেও এখন সাবাড় করে ফেলবে, এত খিদে। এতক্ষণ অতটা খেয়াল ছিল না খাওয়ার কথা। পেটে খাবার পড়তেই শোরগোল শুরু করেছে পেট—আরও দাও! আরও দাও!

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!' গুঙিয়ে উঠল টাকি। 'শেষ পর্যন্ত রাস্তার মড়া তুলেও খেলাম!'

আরও খাবার দরকার।

আশেপাশে তাকাতে লাগল টাকি। যেন রাস্তাটা মরা খরগোশে ভরে থাকলে ভাল হত।

কিন্তু আর কোন খাবার দেখতে পেল না।

উঠে দাঁড়াল টেরি। টাকিকে নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এসে ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

গাছপালায় আড়াল করা মুসাদের বাড়িটাতে যখন পৌঁছল দুজনে, ভোর প্রায় হয়ে গেছে। ভোরের শীতল শিশির বরফের মত ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে। শীতে কাঁপছে ওরা।

অন্ধকার এখনও কাটেনি। গাছপালার মধ্যে অন্ধকার বেশি। তাতে সুবিধেই হলো। নিরাপদে মুসাদের সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

লম্বা, চোখা নখ দিয়ে বেলপুশ টিপতে অসুবিধে হলো টেরির। দরজার থাবা মারতে শুরু করল।

জবাব নেই।

'শীতের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে সবাই,' আফসোস করে টাকি বলল। নিজের অজান্তেই ঘাড়ের লোম ধরে টান দিল। বেশি অস্বস্তি বোধ করলে এ রকম করে সে। জন্তু হয়েও অভ্যাসটা ভুলতে পারেনি।

'জাগাতে হবে,' টেরি বলল।

থাবা তুলে কিল মারতে শুরু করল দুজনে।

তাতেও সাড়া না পেয়ে শেষে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল টেরি। রাগত নেকড়ের চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল গাছপালার গায়ে।

আবার খানিকক্ষণ কিলাকিলি।

অবশেষে খুলল দরজা।

ঘুম জড়িত চোখে দরজা খুলে দিয়েছে মুসা। নীল-সাদা ডোরাকাটা ঢোলা পাজামা পরনে। খুলি আঁকড়ে থাকা কোঁকড়া কালো চুলগুলোকে বিচিত্র লাগছে পেছন থেকে এসে পড়া মৃদু আলোয়।

'খাইছে! ভূত! ভূত!' বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে।

তৈরিই ছিল টেরি। চট করে একটা পা ঠেলে দিল ভেতরে। বুকে ধাক্কা মেরে পেছনে সরিয়ে দিল মুসাকে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে ঢুকল টাকি। মুসাকে ধরে রাখল টেরি, যাতে দৌড়ে গিয়ে কাউকে খবর দিতে না পারে। টাকি লাগিয়ে দিল দরজাটা।

দুজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে মুসাকে হলরুমে নিয়ে এল।

আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুসার। কথা সরছে না মুখে।

অভয় দিয়ে টেরি বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমরা। আমি টেরি। ও টাকি।'

এতক্ষণে খেয়াল করল টাকি, মুসা স্বাভাবিক মানুষই আছে। নেকড়ে-মানব হয়নি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নেকড়ে-মানব হওনি?'

মুসা আরও অবাক। তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল, 'নে-নে-নেকড়ে! তা হব কেন?'

ইস্, মানুষ থাকা অবস্থায় যদি মুসাকে এ ভাবে ভয় দেখাতে পারত! আফসোস করল টেরি। এখন নিজেরাই বেসামাল। মজা পাওয়ার অবস্থা নেই।

'তোমার আব্বা-আম্মা কোথায়? ঘুমাচ্ছে?'

টেরির বিকৃত উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে মুসার। 'বা-বা-ব্বাড়ি নেই। আমি এ-একা!'

'ভালই হলো!' টাকি বলল। এতক্ষণে যেন ভাগ্য খুলতে আরম্ভ করেছে।

'কে-কে-ক্কেন?' মুসার তোতলামো যাচ্ছে না কোনমতে। 'আমাকে খে-খে-খেয়ে ফেলবে নাকি?'

'না, খাব না,' টেরি বলল, 'যদি আমাদের সব কথা মন দিয়ে শোনো।' টাকির দিকে তাকাল, 'চলো, ওই সোফাটায় বসা যাক।'

সোফায় বসল টেরি আর টাকি। মাঝখানে বসাল মুসাকে, যাতে

পালাতে না পারে।

'চাঁদের অসুখে ধরেছে আমাদেরকে, মুসা,' টেরি বলল। 'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম।'

'তোমরাও তো তাকালে,' টাকি বলল। 'তোমাদের কিছু হলো না কেন? কিশোর আর রবিন কি তোমার মতই স্বাভাবিক আছে?'

'আমি স্বাভাবিক নেই!' জবাব দিল মুসা। 'ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি!'

'না, দুঃস্বপ্ন নয়,' টেরি বলল। 'এটা বাস্তব। সত্যি সত্যি নেকড়ে-মানব হয়ে গেছি আমরা।'

'স্বপ্ন না হলে তো আরও খারাপ হলো আমার জন্যে,' মুসা বলল। 'ভুলভাল দেখছি। তারমানে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। আমি এখন বদ্ধ উন্মাদ!'

'তুমি উন্মাদও নও, কিছু নও, পুরোপুরি সুস্থ।'

'আগে কিছু খাবার দাও দেখি আমাদের,' টাকি বলল। 'খিদেয় পাগল হয়ে গেলাম! ফ্রিজে কিছু আছে? যা আছে, সব দরকার। রান্না হোক, কাঁচা হোক, যা আছে সব চাই।'

*

'কোন না কোন চিকিৎসা তো এর নিশ্চয় আছে,' জোর গলায় টেরি বলল। 'অসুখ যেহেতু, ভাল হওয়ার উপায় আছেই। সেটাই জানতে হবে আমাদের।'

গরগর করে উঠে টেরিকে সমর্থন করল টাকি।

মুসাদের ফ্রিজ খালি করে পেট ঠাণ্ডা করেছে দুজনে। সব কথা খুলে বলে মুসাকে বোঝাতেও পেরেছে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে সত্যি সত্যি ওরা নেকড়ে-মানব হয়ে গেছে। ইনডিয়ান গুজবটা মুসারও জানা, সেজন্যে টেরিদের কথা বিশ্বাস করেছে।

'কিন্তু কি চিকিৎসা...' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। আঙুল তুলল, 'দাঁড়াও, মনে পড়েছে। বোরিসভাই একটা গল্প বলেছিল...'

'বোরিসভাইটা কে?' জানতে চাইল টাকি।

'কেন, কিশোরদের কর্মচারী। চেনো না?'

'ও, ওই বোরিস—হোকে হোকে করে যে।'

OK-কে 'হোকে' বলে বোরিস, রকি বীচের যারা ওকে চেনে, সবাই জানে। কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন সে।

'হ্যাঁ, ওই বোরিস,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আল্পস পর্বতের এক বনে একবার ক্যাম্পিঙে গিয়ে নাকি মায়ানেকড়ের গুজব শুনেছিল।'

'মায়ানেকড়েটা কি জিনিস?' টাকির প্রশ্ন।

'এক জাতের ভূত।'

'কিন্তু আমরা তো ভূত নই। জ্যান্ত মানুষ। অদ্ভুত রোগের শিকার। নেকড়ে-মানব হয়ে গেছি।'

'ও-ই হলো। মায়ানেকড়েও যা, নেকড়ে-মানবও তাই!'

'আহ্, বাধা দিয়ো না তো!' টাকিকে ধমক দিল টেরি। 'ওকে বলতে দাও। তারপর?'

'বনের মধ্যে একটা নিরালা কুটিরে এক ইনডিয়ান মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোরিসভাইয়ের,' মুসা বলল। 'সেই মহিলা অনেক ভেষজ ওষুধের খোঁজ রাখে। নানা রকম উদ্ভট রোগ সারাতে পারে। নেকড়ে হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প সেই মহিলাই বলেছিল বোরিসভাইকে।'

'তাহলে সেই মহিলার কাছেই আমাদের যাওয়া উচিত!' চিৎকার করে উঠল টেরি।

'তার কাছে না গিয়েও ভাল হতে পারো তোমরা,' মুসা বলল।

'কি ভাবে!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল টেরি আর টাকি।

'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালে মানুষ নেকড়ে-মানব হয়...'

'যেমন আমরা হয়েছি,' নিজের ওপর আক্রোশ জমেছে টাকির, তাকিয়েছিল বলে। 'কিন্তু তোমরা তিনজনও তো তাকিয়েছিলে। তোমরা হলে না কেন?'

'হয়তো সময়-ক্ষণ ঠিক ছিল না,' জবাব দিল মুসা। 'তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা যখন তাকিয়েছ ঠিক ওই সময়টাতে চন্দ্র-রোগের জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিল চাঁদ।'

'তা হতে পারে,' একমত হলো টেরি। 'বলো, ইনডিয়ান মহিলার কাছে না গিয়ে কি ভাবে ভাল হতে পারি আমরা?'

'বোরিসভাই শুনে এসেছে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে নেকড়ে-মানব হয়ে গেলে পরের চাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। পরের পূর্ণিমাতে তাকালে উল্টো ওষুধ ঢুকবে শরীরে। তাতে ভাল হয়ে যাবে তোমরা।'

'কিন্তু তার জন্যে তো আটাশ দিন অপেক্ষা করতে হবে,' চেঁচিয়ে উঠল টাকি। 'ততদিন বাঁচবই না আমরা...'

'তা অবশ্য ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'মহিলা নাকি বলেছে, ততদিন বাঁচে না কেউ। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায় রোগী।'

'না না না! তাহলে দরকার নেই অপেক্ষা করার!' চিৎকার করে বলল টেরি।

'যা করার এখুনি করো!' টাকি বলল। 'তোমার পায়ে পড়ি, মুসা! আমাদের তুমি বাঁচাও! একটা কিছু ব্যবস্থা করো! কথা দিচ্ছি, জীবনে আর

শয়তানি করব না তোমাদের সঙ্গে।'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। তারপর বলল, 'আমি একা তো কিছু করতে পারব না। কিশোরের সাহায্য লাগবে। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'যা খুশি করো,' টেরি বলল। 'দরকার হয়, বোরিস-রবিন সবার সাহায্য নাও। কেবল আমাদের ভাল করার বন্দোবস্ত করো। চিরকাল তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আমরা।'

'বেশ, বসো তোমরা,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'কোথায় যাচ্ছ?' শঙ্কিত হয়ে উঠল টাকি।

'ভয় নেই,' হাসল মুসা। 'কিশোরকে ফোন করব।'

'পুলিশকে খবর দেবে না তো?'

'তোমাদের মত কথার নড়চড় করি না আমরা, টাকি,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'বলেছি যখন সাহায্য করব, করবই। আমি কিশোরকেই ফোন করতে যাচ্ছি।'

এগারো

লোউইনের ছুটিতে এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেছেন মুসার বাবা-মা। টেরিদের সুবিধে হলো সেজন্যে। নিরাপদেই লুকিয়ে থাকতে পারল মুসাদের বাড়িতে। পুলিশ ওদের খোঁজ পেল না।

পুলিশ আর জোয়ালিন যে ওদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ খবর মুসার কাছেই জানতে পারল ওরা।

পরদিন সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় ওরা জানল, ওদের নিয়ে কি করতে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডের ঝরঝরে লক্কর ট্রাকটাতে তোলা হলো ওদের। গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে আনল বোরিস।

সঙ্গে তিন গোয়েন্দা রয়েছে। নেমে গিয়ে ট্রাকের পেছন থেকে লম্বা দুটো ধূসর রঙের প্ল্যাস্টিকের বাক্স নামাতে বোরিসকে সাহায্য করল ওরা।

টেরি আর টাকিকে বলল কিশোর, 'কার্গো ক্যারিয়ারে করে যেতে হবে তোমাদের।' টান দিয়ে একটা বাক্সের ডালা তুলল সে। আরেকটা তুলল মুসা।

'যাও, ঢোকো,' কিশোর বলল। 'মালের সঙ্গে তুলে দেব।'

'কিন্তু...' বলতে গেল টেরি।

'যাত্রীদের সঙ্গে তোমরা যেতে পারবে না,' বোঝাল কিশোর। 'তোমাদের প্লেনেই উঠতে দেবে না। যেতে হলে কার্গো হোল্ডে করেই যেতে

হবে। এটাই একমাত্র উপায়।'

'দম নেব কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

বাক্সের গায়ে ফুটোগুলো দেখাল কিশোর। 'বাতাস ঢোকার পথ, দেখছ না? শ্বাস নিতে অসুবিধে হবে না। জলদি করো। কেউ দেখে ফেললে...'

বাক্সে ঢোকা ছাড়া গতি নেই।

আর তর্ক করল না টাকি বা টেরি। কফিনে শোয়ার মত করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বাক্সের ভেতরে। ডালা নামিয়ে দেয়া হলো ওদের ওপর। তালা লাগিয়ে দিল বোরিস।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে টেরি। গর্জন করে উঠে ঘুসি মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে ডালাটা। জানোয়ারের মত বাক্সে তালাবদ্ধ হয়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

কয়েক মিনিট পর অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল দুজনের। বাক্স তোলা হলো মাটি থেকে। ফুটো দিয়ে টেরি দেখতে পেল, বিমানবন্দরের পোশাক পরা কয়েকজন লোক বাক্স দুটো ঠেলাগাড়িতে তুলে দিচ্ছে।

প্রথমে টেরির বাক্সটা গাড়িতে রাখল ওরা। ভেতরে মানুষ আছে সেটা তো আর জানে না, তাই সাবধানে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন বোধ করল না। আছড়ে ফেলল গাড়ির ওপর। ব্যথা লাগল পিঠে। আপনাআপনি চাপা শব্দ বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে। মনে হয় লোকগুলো শুনতে পায়নি। শুনলে অবাক হতো। খুলে দেখতে চাইত। টেরির বাক্সর ওপর টাকির বাক্সটা রাখল ওরা।

চলতে শুরু করল গাড়ি। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের পেছনের রানওয়ে ধরে এগিয়ে চলল।

ফুটো দিয়ে বিরাট একটা জেটপ্লেনের খানিকটা দেখতে পেল টেরি। বিমানটার নাকের কাছে রাখা মালপত্রের সারি–বাক্স, স্যুটকেস, আরও কত জিনিস। ওগুলোর কাছে নিয়ে এসে প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হলো বাক্স দুটো।

তাকিয়ে আছে টেরি। এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা মালপত্র তুলে নিয়ে নিয়ে কনভেয়র বেল্টে রাখছে। বেল্ট সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে প্লেনের কার্গো হোল্ডে।

ভালই থাকব ওখানে–নিজের মনকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইল টেরি। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনে তুলে নেয়া হবে। রওনা হব নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ওর বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়াল দুজন লোক।

অজান্তেই পেশি শক্ত করে ফেলল টেরি। এতক্ষণে জেনে গেছে, টানা-হেঁচড়ায় ব্যথা লাগে। তার জন্যে তৈরি করল দেহকে।

একটা চিৎকার আতঙ্কের স্রোত বইয়ে দিল তার ধমনীতে। কঠিন কণ্ঠে

বলে উঠল একজন লোক: 'অ্যাই, থামো! থামো! তুলো না বাক্স দুটো!'

টেরির বাক্সটা ছেড়ে দিল লোকগুলো। ঘুরে তাকাল যে লোকটা কথা বলেছে তার দিকে।

'ওই দুটো,' হাত তুলে দেখাল লোকটা। টেরিদের দুটো নয়, পাশে রাখা অন্য দুটো বাক্স।

'ওগুলো টারমিনালে নিয়ে যেতে হবে,' লোকটা বলল। 'থাক এখন। বাকিগুলো তুলে দাও আগে। পরে নিয়ো।'

দমটা আস্তে করে ছাড়ল টেরি। যাত্রাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই।

কয়েক মিনিট পরেই কনভেয়র বেল্টে তুলে দেয়া হলো টেরির বাক্সটা। কার্গো হোল্ডে বাক্সটা আছড়ে পড়ার সময় দাঁত কামড়ে রইল সে। ভয়ানক আছাড়। সাংঘাতিক ব্যথা। চিৎকার করে ওঠা থেকে অনেক কষ্টে বিরত রাখল নিজেকে।

ধুপ্ করে আরেকটা শব্দ কানে এল তার। টাকির বাক্সটা পড়েছে পাশেই।

জায়গাটা অন্ধকার। ঠাণ্ডাও এখানে বেশি। বেশ কয়েকটা কুকুর তোলা হয়েছে হোল্ডের মধ্যে। খাঁচায় আটকা থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে ওগুলো।

শব্দটা রাগিয়ে দিল টেরিকে।

কুকুরের মাংসের কথা ভেবে জিভে জল এল। খেয়ে ফেলবে নাকি ধরে? খাবারের কথা ভাবতেই পেটের মধ্যে খিদে মোচড় দিয়ে উঠল।

হাত দুটো তুলে ডালায় ঠেকাল। চাপ দিয়ে ভাঙতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। এখন এ সব করতে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। টাকিকে ডাক দিল, 'টাকি, কুকুর খেতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে!'

'খবরদার। ওকাজও করতে যেয়ো না। ভাল হওয়ার আশা চিরকালের জন্যে ছাড়তে হবে তাহলে।'

'কিন্তু ওগুলোর চিৎকার মাথা গরম করে দিচ্ছে আমার!'

'দাঁড়াও, থামাচ্ছি।'

ভয়ানক এক হাঁক ছাড়ল টেরি।

প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে গেল কুকুরগুলো। ঘেউ ঘেউ বাদ দিয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল দু'একটা, বাকিগুলো চুপ।

'টেরি, তোমার ভয় লাগছে?' টাকি জিজ্ঞেস করল।

জীবনে এত ভয় লাগেনি। কিন্তু স্বীকার করল না টেরি। 'ভয় নেই, টাকি। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো।'

বারো

'পথ হারিয়েছি আমরা!' ঘোষণা করল বোরিস।
প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সবাই। পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট এয়ারপোর্ট থেকে একটা জীপ ভাড়া করে এগিয়েছে ওরা। এক ঘণ্টা ধরে চলেছে বনের ভেতরের সরু একটা রাস্তা ধরে।

তারপর সামনে পড়েছে কাঁচা রাস্তা। পেছনে তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সারা আকাশে রঙের লালিমা।

কাঁচা রাস্তায় নেমে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়েছে গাড়ি। সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘন পাইনের দেয়াল।

ঘন বনে গাড়ি ঢোকানো যায়নি। অগত্যা নামতে বাধ্য হয়েছে ওরা। গাড়িটা রেখে, মালপত্র সব বের করে নিয়ে হেঁটে ঢুকেছে।

ধূসর আকাশের রঙ বেগুনি হয়ে এল। ঝুপ করে নামল বনের অন্ধকার। বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। চাঁদ নেই। তারাও না, যার ওপর নির্ভর করে পথ চিনে এগোবে।

আগে আগে হাঁটছিল বোরিস। তার হাতের টর্চের আলো নেচেছে বনের গাছপালা আর বড় বড় পাথরে। তারপর হঠাৎ করেই এল ঘোষণাটা।

'এদিক দিয়েই তো গিয়েছিলাম,' বলল সে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি। চিনতে পেরেছি। ওই যে ছোট পাহাড়টা।...নাহ্, এতক্ষণে ঠিক পথে এগোচ্ছি। পাহাড়ের কিনার দিয়ে ওই যে রাস্তা চলে গেছে, সেটা ধরে গেলে পাওয়া যাবে মহিলার কেবিন।'

খানিক পরেই সংশয় দেখা দিল তার মনে। সত্যি এ পথেই গিয়েছিল তো?

ফিরে তাকাল রবিন। 'ওরা কোথায়?'

টেরি আর টাকি নেই ওদের সঙ্গে। থেমে দাঁড়াল সবাই।

কিশোরের প্রশ্ন, 'গেল কোথায়?'

টর্চের আলো ফেলে মুসা বলল, 'ওই যে। চলো তো দেখে আসি, কি খাচ্ছে।'

বনে ঢুকেই খাবারের সন্ধানে ছিল টেরি আর টাকি। প্রচণ্ড খিদে সহ্য করতে না পেরে ব্যাজার আর র‍্যাকুন মেরে খাওয়া শুরু করেছে। বনে পথ হারানো নিয়ে আপতত কোন চিন্তা নেই ওদের।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওদের কাঁচা মাংস খাওয়ার নমুনা দেখে মুসার পর্যন্ত গা গুলিয়ে উঠল।

টেরি আর টাকিকে তুলে নিয়ে আবার শুরু হলো অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ চলা। মাটিতে বিছানো শুকনো পাতার পুরু কার্পেট। পায়ের চাপে মচমচ করছে।

ছোট্ট এক টুকরো গোলাকার, ঘাসে ঢাকা জমিতে এসে পৌঁছল ওরা। লম্বা চুলে ধীরে ধীরে টান মারতে আরম্ভ করল বোরিস। অনিশ্চয়তার লক্ষণ। এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে সরাল ব্যাকপ্যাকটা। চারপাশে তাকাল। তৃতীয়বারের মত ঘোষণা করল, 'এবার বুঝতে পারছি, সত্যি পথ হারিয়েছি!'

গাছের ডালে পেঁচা ডাকল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছোট ছোট জানোয়ারের হুটোপুটি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলফেরার খসখস, সড়সড় শব্দ।

'নিশ্চয় অন্য কোন রাস্তা আছে, একই রকম দেখতে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল বোরিস। 'একেবারে উল্টোদিকে চলে এসেছি।'

'তাহলে এখানেই ক্যাম্প করে থেকে যাই,' কিশোর বলল। 'আবারও পথ হারনোর সম্ভাবনা আছে। অন্ধকারে অহেতুক আর ঘোরাঘুরি না করে...'

'ওটা কি? আলো না?' বাধা দিয়ে বলে উঠল মুসা।

সবাই তাকাল তার নির্দেশিত দিকে। খুদে একটা কমলা রঙের আলো চোখ পড়ল সবারই। গাছপালার মধ্যে দিয়ে একবার চোখে পড়ে, আবার পড়ে না।

'আগুন নাকি?' ফিসফিস করে বলল রবিন। জোরে বললে যেন চলে যাবে আগুনটা।

মিটমিট করতে থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে তো হচ্ছে।'

'চলো, দেখে আসি,' বোরিস বলল।

গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল ওরা। কাছে এলে চোখে পড়ল কেবিনটা। ভেতরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের আগুনের আভা পড়েছে জানালার কাঁচে।

'এটাই কি সেই মহিলার কেবিন?' জানতে চাইল টেরি। ভেতরে ঢোকার জন্যে আর তর সইছে না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো!' উত্তেজিত হয়ে উঠল বোরিস। 'তারমানে শেষবার ঠিক পথেই এগিয়েছি।'

ভেতরটা দেখার জন্যে জানালার কাঁচে গিয়ে নাক চেপে ধরল কিশোর। দেখাদেখি মুসা আর রবিনও এসে দাঁড়াল। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় কাঁচটা গরম।

ভেতরে তাকিয়ে থেকে আলোটা চোখে সইয়ে নিতে লাগল কিশোর।

'কই, কাউকে তো দেখছি না,' মুসা বলল।

'আগুন যখন জ্বলছে,' কিশোর বলল, 'কেউ না কেউ নিশ্চয় আছে।'

'বোঝার একটাই উপায়,' কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে অস্থির ভঙ্গিতে দরজায় গিয়ে কিল মারতে শুরু করল টাকি। দমাদ্দম কিল।

জবাব এল না কেবিন থেকে।

রাগে গর্জন করে উঠল টাকি। তাকে সাহায্য করতে গেল টেরি। তিন গোয়েন্দা বা বোরিস বাধা দেবার আগেই এত জোরে কিল মারতে লাগল, মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করল কাঠের চিলতে।

উৎসাহ পেয়ে আরও কিলানোর জন্যে মুঠি তুলতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়ানো সাদা-চুল এক মহিলা। হাতে একটা হান্টিং রাইফেল। বড় জানোয়ার শিকার করার।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল মহিলা, 'সরো! সরে যাও আমার দরজা থেকে! নইলে গুলি খেয়ে মরবে!'

তেরো

গর্জন করে উঠল টাকি।

রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকাল মহিলা।

'সরো! ভাগো!'

'প্লীজ!' এগিয়ে গেল বোরিস, 'গুলি করবেন না। আপনার কাছেই এসেছি আমরা।'

বোরিসের দিকে ঘুরে গেল রাইফেলের নল। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে মহিলার চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর নরম হলো দৃষ্টি।

'আপনি!...বোরিস না?'

'হ্যাঁ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বোরিস। 'চিনতে তাহলে পারলেন।'

কিন্তু রাইফেল নামাল না মহিলা। বোরিসের বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আবার এলেন কেন?'

'আপনার সাহায্য দরকার,' বোরিস বলল। 'এই ছেলেগুলোর...' টেরি আর টাকিকে দেখাল সে। 'ভীষণ বিপদে পড়েছে ওরা। একমাত্র আপনিই ওদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন।'

আরেকবার দ্বিধা করে অবশেষে রাইফেল নামাল মহিলা। তবে সতর্ক থাকল, প্রয়োজন পড়লেই আবার যাতে ঝট করে তুলে নিতে পারে। বোরিসের পেছনে দাঁড়ানো তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল। নজর ফেরাল টেরি আর টাকির দিকে। কুঁচকে গেছে ভুরু। কপাল আর গালে ভাঁজ

পড়েছে শুকনো ফলের মত।

কেঁপে উঠল সে। গায়ের চাদরটা ভালমত টেনে দিল। বোরিসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ওদের? কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'চাঁদের অসুখ,' বোরিস বলল। 'হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে এখন এই অবস্থা।' ভারী ব্যাকপ্যাকটাকে কাঁধ বদল করল আবার। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার।

'ওরা কারা?' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল মহিলা।

'ওরা এদের ব...' বন্ধু বলতে গিয়েও থেমে গেল বোরিস, কারণ জানা আছে, টেরি-বাহিনী মোটেও বন্ধু নয় তিন গোয়েন্দার। 'শত্রু' বললেও ঝামেলা। মহিলাকে বোঝানোর জন্যে অনেক কথা খরচ করতে হবে তখন। শেষে বলল, 'এদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'কি যেন বললেন? কি হয়েছে এদের? চাঁদের অসুখ!'

এখনও দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা, ভেতরে যেতে দিচ্ছে না ওদের। এক হাত রাইফেলের নলে। 'সেই যে গল্পটা বলেছিলাম আপনাকে?'

'গল্প নয়, বাস্তব, দেখতেই তো পাচ্ছেন,' বোরিস বলল। 'সেদিন আপনার কাছে শুনে আমার কাছেও গল্পই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা সত্যি। যদিও এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'অসম্ভব!' ভ্রূকুটি করল মহিলা। 'গল্প গল্পই। হ্যালোউইনের রাতে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের অসুখ হয়, চন্দ্রজ্বরে ধরে মানুষকে, ওটা শুধুই গল্প। কোন সত্যতা ছিল না এর মধ্যে।'

'তাহলে হলো কি করে আমাদের!' ধমকে উঠল টেরি। 'আপনার কি ধারণা চামড়ার পোশাক প'রে নেকড়ে-মানব সেজে আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি আমরা?'

'হ্যাঁ, এই যে দেখুন,' টেনে দেখাল টাকি, 'সত্যিকারের লোম।'

রাইফেলের নলে শক্ত হলো মহিলার আঙুল। 'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল। ঝাঁকি লেগে সাদা চুলগুলো নেচে উঠল গায়ের নীল চাদরটার ওপর। বুড়ো চোখের মণি দুটোকে লাগছে পানিতে ভর্তি, টলটলে। বোরিসের দিকে তাকাল, 'এই উদ্ভট গল্প শোনাতে কেন এসেছেন? পাগল পেয়েছেন আমাকে?'

মহিলার কথায় শঙ্কিত হয়ে উঠল বোরিস। 'ওদের কি আপনি সাহায্য করতে পারবেন না? কত রকম ওষুধই তো আপনার জানা। চন্দ্রজ্বরের কি কোন চিকিৎসা নেই?'

'কি করে জানব?' কাটা কাটা জবাব দিল মহিলা। 'যে রোগটা হয় মানুষের জানতামই না কখনও, তার ওষুধ দেব কি করে?'

দৃষ্টি বিনিময় করল টাকি আর টেরি। নিরাশায় ভরে উঠল মন। ভয়ঙ্কর

এক দানবীয় খোলসে আটকা পড়েছে ওরা চিরকালের জন্যে! কেউ ওদের ভাল করতে পারবে না আর।

এগিয়ে এল কিশোর, 'আপনার জানামত এমন কি কেউ নেই, যে ওদের ভাল করতে পারে?'

টেরি আর টাকির মনে ক্ষীণ আশার পরশ বুলাল মহিলার পরের কথাটা, 'এ বনে একজন লোক আছে, যার পক্ষে ওদের ভাল করা সম্ভব হলেও হতে পারে।'

'কে!'

'কে!'

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল টেরি আর টাকি।

ওদের বিকৃত, জানোয়ারের মত চিৎকার কাঁপিয়ে দিল মহিলাকে।

'ডক্টর ম্যাডের কাছে ওদের নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন,' বোরিসকে বলল মহিলা। 'লোকটার আসল নাম কেউ জানে না। আধপাগল, খেপাটে স্বভাবের বলেই তার নাম হয়ে গেছে ডক্টর ম্যাড। সত্তর বছর ধরে এ বনে বাস করছে সে। তার কাছে যেতে ভয় পায় লোকে। তার একটা ছেলে আছে। ওটাও নাকি পাগল। তবে ওই ডাক্তারই আপনাদের একমাত্র ভরসা।'

ভাঁজ পড়া চিবুকে হাত বোলাল মহিলা। 'মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার, হাতুড়ে নয়। কাজেই কোন উপায় হলেও হতে পারে।'

'কোন্দিকে তার বাড়ি?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

হাত তুলে দেখাল মহিলা। হাতটা কাঁপছে। 'এই রাস্তা ধরে চলে যান। বেশি দূরে না। বনের মধ্যে যারা বাস করি আমরা, কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি। আপদ-বিপদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল বোরিস। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যা'ম। আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

জবাব দিল না মহিলা। দরজাটা লাগিয়ে দিল। ছিটকানি, খিল, যা কিছু আছে, সব লাগিয়ে দিল একে একে। শব্দ শোনা গেল বাইরে থেকেও।

যে পথে এসেছিল, সে-পথে আবার ফিরে চলল কিশোররা। মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। পাইনের বনে রহস্যময় ছায়া ফেলেছে। ঘোলাটে আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল ওরা।

চুপ করে আছে টেরি আর টাকি।

ওদের জন্যে এ মুহূর্তে মায়াই লাগছে কিশোরের। হয়তো সেই পাগলা ডাক্তার সত্যি ওদের রোগ ভাল করে দিতে পারবে।

দেখা যাক!

চোদ্দ

মহিলা বলেছে, ডাক্তারের বাড়িটা কাছেই। কিন্তু বহুক্ষণ হেঁটে এসেও বাড়ির চিহ্ন চোখে পড়ল না। প্রায় দুই ঘণ্টা হেঁটে ফেলেছে।

অবশেষে বাড়িটা যখন চোখে পড়ল, গাছপালার মাথার ওপারে তলিয়ে যাচ্ছে চাঁদ। ভোরের সূর্যালোক চওড়া লাল ফিতের মত ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তে।

বাড়িটা লম্বা। নিচু চালা। কাঠের তৈরি।

কাছে যাওয়ার পর মুসা বলল, 'অত জাল দিয়ে কি করে?'

বাড়ির চারপাশে লম্বা খুঁটি গেড়ে মাছ ধরার জালের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। আরেকটা জাল ছড়ানো রয়েছে মাথার ওপরে, বাড়িতে ঢোকার দরজা থেকে রাস্তা পর্যন্ত।

'নিশ্চয় মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করে না ওগুলো,' রবিন বলল। 'কয়েক মাইলের মধ্যে তো পানি চোখে পড়ছে না।'

বাড়িটা রয়েছে একটা ঢালের ওপর। পাইন গাছের ছায়ায়।

ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে লম্বা ঘাসের মধ্যে লালমত একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের।

কি ওটা? নৌকা?

সে কিছু বলার আগেই মোটাসোটা একজন লোককে দেখা গেল, ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে ওদের দিকে। লম্বা লাল চুল কাঁধ ছাড়িয়েছে, সিংহের কেশরের মত দেখাচ্ছে। গায়ে ওভারঅল আর একটা সাদা সোয়েটার।

'আপনি ডাক্তার ম্যাড?' বোরিস জিজ্ঞেস করল।

জবাবে হেসে উঠল লোকটা। হাঁটার তালে তালে ভুঁড়ি নাচছে।

কাছে এসে টেরি আর টাকিকে দেখে থমকে গেল। 'আরি!' চিৎকার করে উঠল, 'কি হয়েছে ওদের?'

'আপনি কি ডাক্তার ম্যাড?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করল আবার বোরিস।

মাথা নাড়ল লোকটা। ঝাঁকি লেগে নেচে উঠল গালের থলথলে ফোলা মাংস। 'না, স্যার, আমি তার ছেলে।'

টেরি আর টাকির দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'আমার নাম আসলে বেরি। কিন্তু সবাই ডাকে লায়ন।'

'লায়ন? মানে সিংহ?' বোরিস বলল, 'নিশ্চয় ওই কেশরের মত চুলের

জন্যে?'

হেসে উঠল বেরি। 'হবে হয়তো।'

লাল জিনিসটা নৌকাই। ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এই শুকনোর মধ্যে নৌকা দিয়ে কি করেন?'

জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল বেরি। ঢালের নিচটা দেখিয়ে বলল, 'এখন শুকনো বটে, কিছুদিন পরেই পানিতে থই-থই করবে। মাছে ভরে যাবে। ধরা পড়বে জালে।'

'তারমানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'বৃষ্টির দিন আসছে,' ভবিষ্যদ্বাণী করার মত করে বলল বেরি। ফোলা গাল ডলল। একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল তার গোল-আলু মুখে। 'সারা বন ডুবে যাবে বন্যার পানিতে। নদীর মত স্রোত বইতে থাকবে। সে-সবের জন্যে তৈরি থাকি আমি আর বাবা।'

নৌকাটার একপাশে লাথি মারল সে। 'এ বনে আমরাই শুধু সব কিছুর জন্যে রেডি থাকি।'

আসলেই পাগল, বুঝতে পারল কিশোর।

এর বাবাও যদি এরই মত পাগল হয়, টেরি ও টাকির কোন আশা নেই আর।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে টেরির ঘাড়ের লোম চেপে ধরল বেরি। হ্যাঁচকা টান মারল।

ব্যথায় 'আউ' করে উঠল টেরি।

তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল বেরি। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। 'অ, আসলই!' চোখ সরু সরু করে তাকাতে লাগল টেরি আর টাকির দিকে। 'তোমরা কি সত্যিকারের মানুষ? নাকি শিম্পাঞ্জীর সঙ্কর?'

রাগ দমন করতে না পেরে গর্গর্ করে উঠল টাকি। এক পা আগে বাড়ল।

শঙ্কিত হলো কিশোর। মারামারি বাধাতে চায় নাকি!

টেরির দৃষ্টিও ভাল না। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, বেরিকে মেরে খেয়ে ফেলতে চায়।

তবে অঘটন ঘটতে দিল না বোরিস। তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। 'বেরি, এই ছেলেগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে আপনার বাবার কাছে। উনি তো ডাক্তার, তাই না?'

'এ কথাই তো বলে বেড়ায় সবাইকে,' জবাব দিল বেরি। জোরাল বাতাস বয়ে গেল। ঘাড়ের কেশর উড়াল তার। খুঁটিতে জড়ানো জালগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে গেল।

'ছেলে দুটো বিপদে পড়েছে,' আবার বলল বোরিস। 'ডাক্তার সাহেবের

সঙ্গে কি দেখা হবে এখন?'

খিকখিক করে হাসল বেরি। কৌতুকে নেচে উঠল কুতকুতে চোখ। যেন খুব মজা পাচ্ছে। হাড্ডিসার একটা আঙুল নেড়ে ডাকল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

হাসিটা রহস্যময় লাগল কিশোরের কাছে। আঙুলটা অদ্ভুত! অত মোটা শরীরের এ রকম আঙুল হয় কি করে?

কোন কথা না বলে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল বেরি।

নীরবে তাকে অনুসরণ করল অভিযাত্রীরা।

পাশের একটা দরজা দিয়ে সবাইকে ঘরে নিয়ে এল বেরি। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। ছোট ফায়ারপ্লেসে সারারাত আগুন ছিল। এখন ধিকিধিকি জ্বলছে শুধু লাল কয়লা।

ঘরের একধারে কতগুলো তাক। তাতে নানা রকম প্রাণীর হাড়গোড়, পাখির পালক, ঠোঁট, নখ, শুকনো গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়। চালার কাছে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে মাকড়সার জালের মত বানানো হয়েছে। কেন, বেরিই জানে। হতে পারে, পাগলামি। বড় একটা টেবিলে প্রচুর শিশি-বোতল দেখা গেল। আরেক দিকের দেয়াল ঘেঁষে বইয়ের তাক। জিনিসপত্রে বোঝা যাচ্ছে, ডক্টর ম্যাড পাগল হলেও সত্যি ডাক্তার।

লম্বা সরু ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোয়াল ডলল বেরি।

'আপনার বাবা কোথায়?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল বোরিস। 'দেখা করাটা সত্যি জরুরী। বুঝতে পারছেন না? উনি কোথায়?'

রহস্যময় আরেকটা হাসি খেলে গেল বেরির মুখে। 'তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা।'

'কি বলছেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না!'

এক টানে মাথা থেকে লাল চুলগুলো খুলে নিয়ে এল বেরি।

পরচুলা!

বেরিয়ে পড়ল সাদা, পাতলা, বুড়ো মানুষের চুল।

পরচুলা খোলার পর ঘন ঘন কয়েক টানে গাল থেকে খুলে আনলেন নানা আকারের রবার। ফোলা থলথলে গাল উধাও হলো। বেরিয়ে এল চোয়াল বসা গাল। কাপড়ের নিচ থেকে ভুঁড়িটাও খুলে ফেলে দিলেন বৃদ্ধ।

ছদ্মবেশে ছিলেন!

অবাক হয়ে তাঁর কাণ্ড দেখছে তিন গোয়েন্দা। বোরিস চুপ। টেরি আর টাকিও চুপ।

হাসি চলে গেছে ডাক্তারের মুখ থেকে। 'একটা ছেলের জন্যে সারাটা জীবন কি মর্মান্তিক যাতনাতেই না কেটেছে আমার। কিন্তু কোনভাবেই একটা ছেলে পাইনি। সে-জন্যে নিজের মধ্যেই তাকে তৈরি করে নিই।

আমিই আমার ছেলে হই, আবার বাবা হই।'

মহিলা ঠিকই বলেছে, ভাবল কিশোর, ডক্টর ম্যাড আসলেই পাগল। বদ্ধ উন্মাদ। টেরি আর টাকিকে এই লোক কি চিকিৎসা করবেন?

'বনের মধ্যে এখানে বড়ই নির্জন,' বলে চলেছেন ডক্টর ম্যাড। 'নিঃসঙ্গতা সইতে পারি না। বেরিকে কাছাকাছি রাখলে একাকীত্ব বোধটা কাটে।'

মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাল পরচুলাটার দিকে তাকাল বোরিস। মুখ তুলল ম্যাডের দিকে। 'ডক্টর ম্যাড, আপনি এই ছেলে দুটোকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারেন? চাঁদের অসুখের ওষুধ কি জানা আছে আপনার?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে টেরি আর টাকির দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যাড। জিভ দিয়ে টোকা দিচ্ছেন দাঁতে।

রাগ দানা বাঁধতে শুরু করল টেরির মগজে। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। ঘর, ঘরের জিনিসপত্র, জানালা-দরজা সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে যদি পারত, রাগ হয়তো কমত কিছুটা।

অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কিছুই করার নেই যেন তাদের। এ কোনও রহস্য নয় যে সমাধান করবে; অ্যাডভেঞ্চার নয়, দুঃসাহসী, নির্ভীক অভিযাত্রীর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ এক অদ্ভুত, অজানা রোগের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, যার সমাধান কেবল ডাক্তারই দিতে পারেন।

টেরির মতই টাকিরও রাগ মাথা চাড়া দিচ্ছে। সব রাগ গিয়ে পড়ল ডাক্তার ম্যাডের ওপর। যুক্তিতর্কের ধার ধারল না। সে ভাবছে, ডাক্তার ম্যাড পাগল, এ রোগের ওষুধ তিনি জানেন না। আর জানেন না বলেই ওদেরকে চিরকাল দানব থেকে যেতে হবে।

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বইয়ের তাকের দিকে হেঁটে গেলেন ডক্টর ম্যাড। আপনমনে গুনগুন করতে করতে তাক থেকে টেনে নামালেন পুরানো, ধুলো পড়া গোটা তিনেক মোটা মোটা বই। গুঙিয়ে উঠলেন ওগুলোর ভারে। বয়ে নিয়ে এসে ফেললেন পড়ার টেবিলে।

সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বইগুলো টেনে নিয়ে একমনে পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল টেরি আর টাকি। তিন গোয়েন্দা ও বোরিস তাকিয়ে আছে আগ্রহী, কৌতূহলী দৃষ্টিতে। কেউ কোন কথা বলছে না।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুললেন ডাক্তার। 'এত ছোট লেখা, পড়তে কষ্ট হচ্ছে। বুড়ো মানুষের চোখ তো। বেরিকে দিলে বরং ভাল করে পড়তে

পারত।'

'কিছু কি পেলেন?' উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল বোরিস। 'কোন ওষুধ?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'না, ওষুধ পাইনি। ওই ধরনের কোন রোগের উল্লেখ নেই মেডিক্যাল সাইন্সে। তবে ইনডিয়ান ওঝারা বলে, এ রোগে যদি কাউকে ধরে, পরবর্তী পূর্ণিমার জন্যে অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। যদি ততদিন বেঁচে থাকে, আবার চাঁদের দিকে তাকালে তার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।'

এতটাই হতাশ হলো টেরি, ধপ করে মেঝেতেই বসে পড়ল। টাকির চোখ জ্বলে উঠল। সব রাগ গিয়ে পড়ল আবার টেরির ওপর। টেরির দোষেই ওদের আজ এই দুরবস্থা।

তার মনোভাব বুঝে ফেলল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'বোরিসভাই, ওকে ধরুন! ও মারামারি করতে যাচ্ছে!'

সবাই মিলে ধরে ফেলল টাকিকে। ঠেকাল।

'এক কাজ করো তোমরা, আমার এখানেই থেকে যাও,' টেরি আর টাকিকে পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। 'শহরে, মানুষের মাঝে গিয়ে বাস করতে পারবে না। তোমাদের জন্যে জঙ্গলেই এখন মঙ্গল।'

'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি,' বোরিস বলল। 'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন?'

'আপনারা এতদিন থেকে কি করবেন? বাড়ি চলে যান,' ডাক্তার বললেন। 'পরের পূর্ণিমার সময় নাহয় চলে আসবেন আবার। ততদিনে দেখি, আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি ওদের।'

পনেরো

'কিছু কিছু খারাপ জিনিসেরও ভাল দিক থাকে,' ডাক্তার ম্যাড বলেছেন। 'তোমাদের জন্যে সেই ভালটাই আমি বের করে আনব। আমি তোমাদের বিখ্যাত বানিয়ে দেব।'

সেটা তিন সপ্তাহ আগের কথা।

চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত খাঁচায় থাকতে হচ্ছে টেরি আর টাকিকে। ভ্যান গাড়িতে করে ভ্রমণ করছে। কার্নিভাল, মেলা, সার্কাস–যেখানেই ওদের দেখানোর সুযোগ হচ্ছে, দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার, টিকিটের বিনিময়ে।

খাঁচার ওপরে লেখা:

ডাক্তার ম্যাডের দানব পুত্র।

এক সময় এরা মানুষই ছিল।

এখন জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

পাঁচ ডলারের টিকেট কেটে ওদের দেখতে আসে লোকে। প্রচণ্ড ভিড় হয়। মেলা বা কার্নিভালের প্রধান আকর্ষণ ওরা।

মানুষেরা চলে গেলে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে টেরি আর টাকি। তাদের বোঝান ডাক্তার, 'এটাই তোমাদের জন্যে শান্তি। এরচেয়ে বেশি আর পাবে না। তোমরা কি মনে করো, বাড়ি ফিরে গেলেই শান্তি পাবে? পথে বেরোতে পারবে না, স্কুলে যেতে পারবে না, সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে হবে। সেটাও খাঁচা। এখানে তো তা-ও ঘুরে বেড়াতে পারছ। ওখানে তা-ও পারবে না। আর টিকিটের দাম নিচ্ছি কেন জানো? তোমাদের জন্যেই। রাক্ষুসে খিদে তোমাদের। এত খাবারের জোগান দেব কোত্থেকে আমি?'

চুপ হয়ে যায় টেরি আর টাকি। আসলে ওরা পরবর্তী পূর্ণিমার অপেক্ষায় রয়েছে। তাই ডাক্তারের কথায় বিশেষ তর্কটর্ক করে না। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে যে এরচেয়ে ভাল থাকতে পারবে না, এটাও বোঝে। ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগে না, তবে দর্শকদের ওপর প্রায়ই খাপ্পা হয়। বড় বিরক্ত করে ওরা।

দুজনের দিকে আঙুল তুলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ওরা। হাসাহাসি করে। বাদাম আর পপকর্ন ছুঁড়ে দেয় কেউ কেউ খাঁচার ফাঁক দিয়ে। খেপানোর চেষ্টা করে। গর্জন শুনতে চায়। এ সবই অবশ্য করতে পারে ওরা, ডাক্তার যখন কাছাকাছি না থাকেন।

ওরা দুজনের নাকে খোঁচা মারার চেষ্টা করে। লোম ধরে টানে।

একদিন একটা লোক খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেরির পায়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিল। এত রাগ হয়েছিল টেরির, হাত চেপে এমন জোরে টান মেরেছিল, আরেকটু হলেই ছিঁড়ে যেত লোকটার হাত।

এরপর থেকে ডাক্তার আর খাঁচার কাছে আসতে দেন না কাউকে। মোটা দড়ির বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখেন খাঁচা। কয়েক ফুট দূর থেকে দেখতে হয় দর্শকদের।

খাঁচার দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়। খেপে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে টেরি আর টাকি।

জন্তু হয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে এখন নিজেদের জন্তুই ভাবতে আরম্ভ করেছে দুজনে। লোকের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়ানোর জন্যে

যত রকম প্রচেষ্টা, সব করে।

কিন্তু মানুষেরা ভয় পায় না। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। মজা পায়।

ওদের হাসি খেপিয়ে তোলে টেরি আর টাকিকে। আরও জোরে গর্জন করে ওরা। যত বেশি গর্জন করে, তত বেশি মজা পায় লোকে। দর্শকের ভিড় বাড়ে।

শেষ হয়ে আসছে অপেক্ষার দিনগুলো। সেদিন গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকাল টেরি। চাঁদটা অনেক বড় হয়েছে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে যেন আকাশের মাঝখান দিয়ে।

টাকিকে ডেকে দেখাল।

খানিক দূরে খোলা জায়গাতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন ডাক্তার। ওদের কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। উঠে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো? এত রাতে জেগে আছো কেন? খিদে লেগেছে?'

খিদে ওদের সব সময়ই লেগে থাকে।

বড় একটা ট্রে'তে করে মাংস নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিলেন দুজনের দিকে।

টেনে নিয়ে গপগপ করে খেতে লাগল দুজনে। কাঁচা মাংস। জানোয়ারের মত নখ আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে, সস্নেহ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার।

পাগলামি অনেক কেটে গেছে তাঁর। নিঃসঙ্গতা নেই। নিজেই নিজের ছেলে সাজার আর প্রয়োজন বোধ করেন না।

ষোলো

পূর্ণিমার দিন।

সকাল থেকেই অস্থির হয়ে রইল টেরি আর টাকি। দিন যেন আর কাটেই না। খাঁচার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে ছটফট করতে থাকল দুজনে।

তবে যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, সময় বসে থাকে না। শেষ দর্শকটাও বিদায় নিল। মলিন হয়ে এল দিনের আলো। চাঁদের দিকে তাকাল টেরি। পুরো গোল হয়ে গেছে চাঁদটা।

'সবচেয়ে শয়তান ওই পোলাপানগুলো,' তিক্তকণ্ঠে বলল টাকি। 'আমাদেরকে যেন বাঁদর পেয়েছে। কলার খোসা ছুঁড়ে মারে। খ্যাকখ্যাক করে হাসে।'

এ কথার জবাব দিল না টেরি। রোগটা হওয়ার আগে একই কাজ

ওরাও করেছে চিড়িয়াখানায় গিয়ে। বানরের দুঃখ বোঝেনি। ভোগান্তিটা নিজের না হলে মানুষ কিছু বোঝে না। বলল, 'চাঁদটা দেখেছ?'

'দেখব আর কি? ওটার দিকেই তো তাকিয়ে আছি সারাক্ষণ।'

'কিন্তু আজকে এখনও খাবার দিতে আসছে না কেন ডাক্তার? না বেরোলে, জ্যোৎস্নায় গা ধুতে না পারলে তো কোন লাভ হবে না।'

'চলে আসবে। কার্নিভাল শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পরে তো আসে। এখনও সময় আছে।'

কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি পার হয়ে গেল। ডাক্তার আর আসেন না।

বার বার ডাক্তারের ট্রেলারটার দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

ক্রমেই আকাশের ওপরে উঠছে চাঁদ। গাছের পাতায় ফিসফিস, কানাকানি করে যাচ্ছে বাতাস। কার্নিভালের তাঁবুর কানা পতপত করছে।

ট্রেলারের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে।

ট্রেলারটার আলো নেভানো। কোনও জানালায় আলো নেই। অন্যদিন বেশির ভাগ সময় বাইরেই থাকেন ডাক্তার, হাঁটাহাঁটি করেন, বসে বসে প্রকৃতি দেখেন; কিংবা কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। আজ নেই।

কেন আসছেন না? রাতের খাবার নিয়ে আসারও কোন লক্ষণ নেই।

হঠাৎ টেরি বুঝে ফেলল কারণটা। লাফ দিয়ে উঠে বসল। 'টাকি! ডাক্তার আসবে না!'

'আসবে না মানে? কি বলছ? আসবেই!' চিৎকার করে উঠল টাকি।

'না, আসবে না। আজ যে পূর্ণিমা। আমরা ভাল হয়ে যাই, ডাক্তার এটা চায় না!'

'কেন?'

'গাধাই থেকে গেলে চিরকাল!' গুঙিয়ে উঠল টেরি। 'বুঝতে পারছ না? ডাক্তার আমাদের চিরকাল জন্তুই রেখে দিতে চান। তাহলে যাব না আমরা। তাঁর ছেলের অভাব পূরণ হবে। নিঃসঙ্গ থাকতে হবে না আর তাঁকে। আজ রাতে আমাদের খাঁচার দরজা খুলতে আসবেন না তিনি।'

'নিকুচি করি তার ছেলের অভাবের!' এতক্ষণ নির্লিপ্ত থাকলেও টেরি বুঝিয়ে দেয়ার পর লাফ দিয়ে উঠে বসল টাকি।

তার চোখে ভয় দেখতে পেল টেরি।

'টাকি,' আকাশের দিকে দেখাল টেরি, 'দেখো। চাঁদটা প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় চলে যাচ্ছে। আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। যা করার এখুনি করতে হবে।'

'কি করব?'

*

শিকের ফাঁক দিয়ে ডাক্তারের ট্রেলারের দিকে তাকাল টেরি।

আবার চাঁদের দিকে মুখ তুলল।

ডাক্তারের যুক্তি, বাড়ির চেয়ে এখানে ভাল থাকবে ওরা। কিন্তু কই? দর্শকরা যে ভাবে কলার খোসা ছুঁড়ে দেয়, ব্যঙ্গ করে, তাতে মানসিক স্বস্তি আর কোনমতেই থাকে না।

নাহ্, ওসব শয়তান লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে থাকার আর কোন মানে হয় না। চিরকাল যদি জন্তু হয়েও বাঁচতে হয়, তা-ও থাকবে না আর এখানে। অনেক হয়েছে।

আবার ডাক্তারের ট্রেলারের দিকে তাকাল সে।

দরজা বন্ধ। জানালায় আলো নেই।

ডাক্তার আসবেন না আজ। আরও একটা কথা ভাবছে সকাল থেকেই–কিশোররাও এসে পৌছায়নি, ওদের কি হলো? ওরা কি আসবে না? বাবার কথা ভেবে অভিমানে বুক ভরে উঠল টেরির। একটিবারের জন্যে চোখের দেখা দেখতে আসতে পারছে না? নাকি সেই যে ইটালিতে ব্যবসার কাজে গেছে, আর রকি বীচে ফেরেইনি?

হতে পারে। টাকির বাবা-মাও হ্যালোউইনের ছুটিতে ইয়োরোপে চলে গেছেন। মাস দুই থাকার কথা। নিশ্চয় রকি বীচে ফেরেননি। তাহলে ছেলেকে দেখতে চলে আসতেন।

কেউ আসুক বা না আসুক, সে পরের কথা, আপাতত খাঁচা থেকে বেরোনোর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল টেরি।

রাগ দানা বাঁধতে শুরু করল মগজে। প্রচণ্ড রাগ। হাপরের মত ফুলে উঠতে লাগল বুক।

চিৎকার করে গলা ফাটাতে হবে। গর্জন করতে হবে। নইলে বুঝি খুলিটা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে, চোয়াল ফাঁক করে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল সে।

রাগটা সংক্রমিত হলো টাকির মাঝেও। একই ভাবে সে-ও এক হুঙ্কার ছাড়ল।

তারপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার দরজায়।

খেপে ওঠা হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জনের পর গর্জন করতে করতে ধাক্কা দিতে শুরু করল দরজায়। শিক ধরে টানাটানি করতে লাগল। দরজার চৌকাঠ কাটতে লাগল ধারাল দাঁত দিয়ে। লাথি মারল প্রচণ্ড শক্তিতে।

ওদের মিলিত শক্তির অত্যাচার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না দরজাটা। ভেঙে পড়ে গেল।

আনন্দে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল দুজনে। মাটিতে লাফিয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল ধবধবে সাদা জ্যোৎস্নায়।

টাকির হাত ধরে টান দিল টেরি। 'জলদি চাঁদের দিকে তাকাও! সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে!'

পেছনে চিৎকার শোনা গেল।

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তার। দৌড়ে আসছেন ওদের দিকে। হাতে একটা বন্দুক।

বন্দুক! গুলি করবেন নাকি?

না। তা তিনি করলেন না। তবে কাছে এসে দুজনকে হুমকি দিতে শুরু করলেন, এখুনি খাঁচায় ফিরে না গেলে গুলি করবেন।

কানে তুলল না টেরি বা টাকি।

'জলদি!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'খাঁচায় ঢোকো বলছি!'

বন্দুক তুলে এক পা এগিয়ে এলেন।

আচমকা এক পাশ থেকে লাফ দিল টাকি। ডাক্তারের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। বন্দুকের নলটা সরে গেল একপাশে। লাফ দিয়ে গিয়ে নল ধরে হ্যাঁচকা টানে সেটা কেড়ে নিল টেরি। দানবীয় শক্তিতে পাথরের ওপর বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল বাঁটটা। ভাঙা বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

জন্তুর রাগ অন্ধ করে দিল ওদের মগজ। ডাক্তারকেও ছাড়ল না ওরা। দুজনে মিলে তাঁকে তুলে ধরে বন্দুকটার মতই ছুঁড়ে ফেলল। নরম মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ায় বেঁচে গেলেন তিনি, নইলে হাড়গোড় ভাঙত নির্ঘাত।

তারপরেও ছাড়ল না। আবার তুলে নিল মাটি থেকে। দুজনে মিলে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে চলল খাঁচাটার দিকে। ছুঁড়ে ফেলল খাঁচার মধ্যে।

এতক্ষণে আবার চাঁদের দিকে তাকানোর কথা মনে পড়ল টেরির।

'টাকি! জলদি! সময় নেই!'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণ চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল দুজনে।

রূপালী চাঁদের আলো যেন ধুয়ে দিতে লাগল ওদের দেহ।

ঠাণ্ডা, মোলায়েম আলো।

কাজ হবে তো?

সত্যি রোগ সারিয়ে দেবে ওদের?

সতেরো

ড়িয়েই আছে ওরা। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা পার হয়ে গেল। লম্বা লোমে কাঁপন তুলছে বাতাস। পেছনে পতপত করছে তাঁবুর কানা।

কই, ভাল তো হচ্ছে না! সাদা জ্যোৎস্না কোন উপকারই করতে পারছে

না ওদের। সুস্থ হচ্ছে না ওরা।

একবিন্দু পরিবর্তন ঘটছে না শরীরে। একই রকম থেকে যাচ্ছে।

পেছনে **শব্দ** হতে ফিরে তাকাল টেরি।

খাঁচা **থেকে** নেমে এসেছেন ডাক্তার ম্যাড। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ভাল তোমরা **হবে** না। আমি জানি। বিশ্বাস করো। ভাল করার উপায় থাকলে সত্যি ভাল করে দিতাম তোমাদের। ইনডিয়ানদের গুজব গুজবই...'

জবাবে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল টেরি। অসহায়ের চিৎকার।

'দুঃখ ভুলে যাও, মাই সান,' গভীর মমতায় বললেন ডাক্তার। 'পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করো। এখন থেকে এটাই তোমাদের বাড়ি।'

না! না! না!

বলতে গেল টাকি। নেকড়ের মত লম্বা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘায়িত, বিকৃত চিৎকার।

'না, না! এটা আমাদের বাড়ি হতে পারে না! চিরকাল চিড়িয়াখানার জানোয়ার হয়ে কাটাতে পারব না আমরা!' আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল টেরি। 'তারচেয়ে বরং আত্মহত্যা করব!'

*

পরদিন সকাল বেলা এসে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা। বোরিস এবার আসেনি। গোয়েন্দাদের সঙ্গে এসেছেন টেরির বাবা। প্রথমে গিয়েছিল তারা ডাক্তারের বনের কুটিরে। সেখানে না পেয়ে খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছে ছোট শহরটায়, যেখানে এখন কার্নিভাল চলছে।

তাদের দেখে টেরি আর টাকি খুশি হলো। কিন্তু ডাক্তার হলেন না। গম্ভীর, বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

সারাটা রাতই চাঁদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে টেরি আর টাকি। ভোর হলো। গাছপালার মাথার আড়ালে হারিয়ে গেল চাঁদ। পুবের আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ার পর আর সহ্য করতে পারেনি ওরা। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে কেঁদেছে।

আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার। ভাল ভাল কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

'বাড়ি ফিরে গিয়ে কি করবে?' বললেন তিনি, 'স্কুল, লেখাপড়া, সবই তো গেল। এখানেই থেকে যাও। আমার কাছে।'

কিন্তু থাকতে দিতে রাজি হলেন না টেরির বাবা।

টেরিদের রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে আবার পাগলামি শুরু হয়ে গেল ডাক্তারের। খুঁজে বেড়াতে শুরু করলেন তাঁর লাল পরচুলাটা। টেরি আর

টাকিকে পাওয়ার পর যেটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। •

*

কার্গো হোল্ডে করেই আবার বাড়ি ফিরে চলল টেরি আর টাকি।

সারাটা পথ বাক্সের মধ্যে গুম হয়ে রইল ওরা। কোন কথা বলল না। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

সারাটা জীবন জানোয়ার হয়ে থাকা আর কেউ ঠেকাতে পারল না ওদের...

এয়ারপোর্টে নেমে একটা ভ্যান ভাড়া করলেন টেরির বাবা। বাক্স থেকে বের করলেই লোকের ভিড় জমে যাবে, তাই বাক্সতে করেই ভ্যানে তোলা হলো দুজনকে।

টাকির বাবা-মা ফেরেননি। দুঃসংবাদটা এখনও দেয়া হয়নি ওদের, আশায় আশায়, যে আবার ভাল হয়ে উঠবে টাকি।

পথে স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিলেন টেরির বাবা। বার বার ধন্যবাদ দিলেন ওদের, টেরি আর টাকির জন্যে অনেক করেছে বলে।

*

বিকেল বেলা দুজনকে দেখতে টেরিদের বাড়িতে এল তিন গোয়েন্দা। টাকি ওখানেই আছে। একলা বাড়িতে যেতে দেননি টেরির বাবা।

কোনভাবেই পরাজয়টা মেনে নিতে পারছে না কিশোর। টেরি ও টাকিকে ভাল করার উপায়টা বের না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

অবশ্য সে করবেই বা কি? সে তো আর ডাক্তার নয়। কত জায়গা তো ঘুরে এল। লাভ তো কিছু হলো না।

রকি বীচে ফেরার পর থেকে একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে কিশোরের; প্রবীণ এক ডাক্তার বলেছিলেন: চিকিৎসা করার আগে প্রথমে ভাল করে জেনে নাও রোগটা আসলে কি, কিভাবে এর উৎপত্তি; যত কঠিন রোগই হোক, সারানোর ব্যবস্থা তুমি করে ফেলতে পারবে।

রোগটা কি আসলেই চাঁদের অসুখ? সত্যি সত্যি কি চাঁদের দিকে তাকানোর ফলেই হয়েছে এটা? নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেজন্যেই টেরিদের বাড়িতে এসেছে কিশোর।

টেরির ঘরে ঢুকল। দেখল, মন খারাপ করে জানালার কাছে বসে আছে টেরি আর টাকি।

'কেমন আছো, টেরি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখতেই তো পাচ্ছ!' গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল টেরির।

'একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে এসেছি, টাকি। সেরাতে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে কি কি করেছ তোমরা, কোথায় কোথায় গিয়েছ, সব

খুলে বলো তো। কোন কথা বাদ দেবে না। সামান্যতম কথাও নয়। বলা যায় না, কিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে তোমাদের ভাল করার সূত্র!'

আঠারো

সব খুলে বলতে লাগল টেরি আর টাকি।

কোন রকম বাধা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল কিশোর। রবিন আর মুসাও চুপচাপ রইল।

ক্যান্ডি খাওয়ার কথায় আসতেই হাত তুলল কিশোর, 'এক মিনিট! কি ক্যান্ডি বললে? বেস্ট? ওরকম কোন ক্যান্ডি কোম্পানির নাম তো শুনিনি!'

'সব কোম্পানির নামই যে শুনবে এমন কোন কথা নেই,' টাকি বলল। 'খেলাম। ভাল লাগল। সেজন্যেই নামটা দেখতে বলেছিল টেরি।'

'সবগুলো খেয়ে ফেলেছিলে?'

'না, আছে বোধহয় এখনও একটা,' দেয়ালের দিকে দেখাল টেরি। তার ট্রিক-অর-ট্রীট ব্যাগটা ঝোলানোই রয়েছে। হ্যালোউইনের রাতে উপহার ভর্তি করে নিয়ে আসার পর যে ভাবে রেখে দিয়েছিল, সেভাবেই আছে। হাত দেয়া আর হয়নি। পরদিন সকালে উঠে বাড়ি ছেড়েই পালাতে হয়েছিল।

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগটা নামাতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত উপহার। ক্যান্ডিগুলো ঘাঁটতে শুরু করল সে।

টেরি বলল, 'ওই তো, ওই হলুদ মোড়কটা। ওটাই দিয়েছিল মিসেস জোরোবেল।'

ছোঁ মেরে ক্যান্ডিটা তুলে নিল কিশোর। মোড়কের লেখার দিকে একবার তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। উত্তেজনায় ফেটে পড়তে লাগল। চিৎকার করে ডাকল, 'রবিন! মুসা! দেখে যাও!'

দৌড়ে এল দুই সহকারী গোয়েন্দা। বিচিত্র ভঙ্গিতে শিম্পাঞ্জীর মত লাফাতে লাফাতে টেরি আর টাকিও ছুটে এল।

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'দেখো, লেখাটা...' সবার দেখার জন্যে ক্যান্ডিটা দুই আঙুলে ধরে তুলে ধরল কিশোর।

'কি আর পড়ব,' না তাকিয়েই টাকি বলল, 'বেস্ট বার...'

'না, বেস্ট বার নয়!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ভুলটা এখানেই করেছিলে তোমরা। এতদিন ভুগতেও হয়েছে সেজন্যেই।'

'বেস্ট বার না তো কি?'

'রাতের বেলায় অল্প আলোতে লেখাটা পড়েছিলে তুমি। ভাল করে দেখো এখন।'

'বীস্ট বার!' চিৎকার করে উঠল টেরি।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে টাকি হতভম্ব।

'তাহলে কি দাঁড়াল?' নাটকীয় ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর। 'বীস্ট বানান হলো বি-ই-এ-এস-টি।' টাকির দিকে তাকাল। 'অল্প আলোয়, তাড়াহুড়ায় ভালমত না তাকানোতে পেঁচানো "এ" অক্ষরটা চোখ এড়িয়ে গেছে তোমার। পড়েছ বি-ই-এস-টি, বেস্ট।'

টেরির মুখ দেখে মনে হলো এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে টাকির ওপর।

'তারমানে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অসুখটা হয়নি ওদের?' বিড়বিড় করল রবিন।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'মিসেস জোরোবেল প্রতিশোধ নিয়েছে টেরি আর টাকির ওপর। হ্যালোউইনের রাতে উপহার দেবার ছুতোয় ভয়ঙ্কর জিনিস তুলে দিয়েছে ওদের হাতে। আমি এখন শিওর, এই ক্যান্ডির মধ্যেই রয়েছে নেকড়ে-মানব হবার ওষুধ। ল্যাবরেটরি টেস্ট করলেই বেরিয়ে আসবে। ক্যান্ডিগুলো মিসেস জোরোবেলের নিজের তৈরি। ওষুধটাও। কম্পিউটারের প্রিন্টারে মোড়কের লেখা প্রিন্ট করাও কিছু না।'

ঘর কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল টেরি। 'ওই ডাইনীটাকে আমি ছাড়ব না! টাকি, এক্ষুণি চলো! শয়তান বুড়িটাকে...'

হাত তুলল কিশোর, 'শান্ত হও। মাথা গরম কোরো না। এখনও অন্ধকার হয়নি। রাস্তায় বেরোলেই ছেলেমেয়ের দল পিছু নেবে তোমাদের। রাত নামুক। তারপর বেরোব। আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব মিসেস জোরোবেলের বাড়িতে।'

কিন্তু তর সইছে না আর টেরি ও টাকির।

রাত নামার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইল দুজনে।

*

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মিসেস জোরোবেলের বাড়িতে এসে হাজির হলো পাঁচ কিশোর।

বাড়িটা আগের মতই নির্জন মনে হচ্ছে। কোন জানালায় আলো নেই।

বেলপুশ টিপল কিশোর।

দরজা খুলে দিল না কেউ।

থাবা দিতে গিয়ে দেখল, দরজা খোলা। ঠেলা দিতেই ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। ভেতরে অন্ধকার।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে বের করে আলো জ্বেলে দিল মুসা।

বার বার মিসেস জোরোবেলের নাম ধরে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

হলঘরে ঢুকল ওরা। ঘরটা খালি। কেবল মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। দেখে বোঝা গেল, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে মিসেস জোরোবেল।

টেবিলে সবুজ রঙের কাগজে মোড়ানো কিছু রয়েছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। দুটো ক্যান্ডি। নিচে চাপা দেয়া ভাঁজ করা একটা কাগজ। একপাশে রাখা একটা ফুলদানি। তাতে রাখা ফুলগুলো বহু আগেই শুকিয়ে গেছে।

কাঁপা হাতে একটা ক্যান্ডি তুলে নিল কিশোর। লেখাটা পড়ল: কিউয়ার বার।

কিউয়ার, মানে সুস্থ।

কাগজটা তুলে নিল সে। ভাঁজ খুলল। বাকি চারজন ঘিরে এল তাকে, কি লেখা রয়েছে দেখার জন্যে।

ছোট্ট একটা চিঠি।

মিসেস জোরোবেল লিখেছে:

টেরি ও টাকি,
শিক্ষাটা কেমন লাগল?
আর কোনদিন খারাপ আচরণ করবে মানুষের সঙ্গে?
তোমাদের ভাল হবার ওষুধ রেখে গেলাম। –মিসেস জোরোবেল।

***